কৃষি-ভারতের নগ্নরূপ

নিখিল ভারত কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক
অধ্যাপক গোপাল হালদার
কর্তৃক ভূমিকা লিখিত

সুধী প্রধান

'আজ' ও আগামীকাল' সিরিজ
[সমবায় পাবলিসার্স]
কলিকাতা

ভূমিকা

কে একজন পণ্ডিত লোক বলেছেন—পৃথিবীর প্রথম শিল্প হ'ল কৃষি ; কৃষিই world's earliest industry. ভারতবর্ষ অন্তত আজও কৃষি-প্রধান,—এই সত্য সবাই সগর্বে স্বীকার করবেন। বাংলা দেশ সম্বন্ধে কথাটা আবার আরও বেশি সত্য ; পরিহাসচ্ছলে আমি তাই বলি, বাংলার কাল্‌চার হচ্ছে পৃথিবীর অগ্রগণ্য কাল্‌চার ; কারণ তার নাম এগ্রিকাল্‌চার। কিন্তু কথাটা একেবারে পরিহাস নয়। 'বাংলার কৃষ্টির' মূল হচ্ছে কৃষি, বাঙালীর জীবিকা কৃষি ; অন্য সব হচ্ছে বাঙালীর উপজীবিকা, শতকরা দশজনও তাতে খেতে-পরতে পায় না।

অথচ এই নব্বুই জনের কার জমির সঙ্গে সম্বন্ধটা কি, জমির উপরে কি-ভাবে কতটা কে নির্ভর করে,—সে বিষয়ে আমাদের জানবারও দরকার হয় না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বোধহয় বেশ পরিষ্কার হবে। বাংলা দেশের এখনকার সরকার তো কৃষক-প্রাণ। তাঁদের প্রচার বিভাগের কর্তা মাস-তিন পূর্বে এক ফরমান জারি ক'রে জানালেন :— 'ধান-চালের দর মফঃস্বলে খুব বাড়ছে, তার অনেক কারণ, কিন্তু তাই ব'লে যে একটা চীৎকার উঠেছে—ধান-চালের দর বেঁধে দেওয়া হোক, এটা মোটেই কৃষকের স্বার্থের অনুকূল নয়। কারণ, ধান-চালের দর বাড়লেই তো বাংলার কৃষকের মঙ্গল।' —এমন সরল সত্য আর নেই! আমার সাংবাদিক-রাজনৈতিক বন্ধুও তাই প'ড়েই লাফিয়ে উঠে বললেন, 'ঠিকই তো, এটা চাকুরে আর মজুরদের একটা চেঁচামেচি।' দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীটা ঠিক এত সরল

নেই। এই কৃষকদের মধ্যে শতকরা ক'জন আজ ক্ষেত-মজুর আর ক'জন জমিওয়ালা কৃষকই-বা বছরের খাদ্য তুলে রাখতে পারে,—সে প্রশ্ন এঁদের মনেও উদয় হয়নি। —এমনি ভাবেই বাংলা দেশের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের 'বাণিজ্য সম্পাদক' আমাকে জানিয়েছিলেন: 'পাট পাট ব'লে আপনারা চেঁচাচ্ছেন কেন? বাংলার কৃষকের পাটে কি যায়-আসে? পাট না চাষ ক'রে জমিতে অন্য ফসল দিক না। আর, মনি-ক্রপ (বিক্রীর ফসল) বলছেন কি? —ওসব কিছু নেই।' এ এতই মৌলিক গবেষণা যে, যে সহৃদয় সরকার বাংলার পাটচাষীদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, 'পাট বিক্রী করো না, ধ'রে থাকো,' তাঁরাও এ গবেষণা সাহস ক'রে করতে পারতেন না।

আসলে কৃষি-প্রধান বাংলা দেশের—ও ভারতবর্ষের—রূপটা হয় আমরা চিনি না, নয় আমরা নিজেদের স্বার্থে এমনি জড়িয়ে পড়েছি যে, তা চিনতে চাই না। এ বিষয়ে আগেকার যুগের বাঙালী মনস্বীদের মধ্যে যে চিন্তার বাস্তবতা ও বুদ্ধির সত্যনিষ্ঠা দেখা যেত, আজ আর তা-ও সুলভ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এদিকে যে আশ্চর্য দৃষ্টির পরিচয় দেন, তা বিশ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথায়' আবার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তারপরে বাংলা দেশেও কৃষকের কথা আন্দোলনে রূপ পেতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা বুদ্ধি-বিলাসী ছিলেন তাঁরা নিজ-নিজ শ্রেণীগত স্বার্থের সংবন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে কৃষক সভা যত প্রচারপত্র বের করে, বুদ্ধিজীবীর দল ততই অপপ্রচারের দলে যোগ দিতে থাকেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কিছুকাল পূর্বে শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের The Land Problems of India প্রকাশিত হয়। বছর আটেক পরে শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ফ্লাউড্ কমিশনের সামনে

সাক্ষ্য দেন। এই দুই কালের তফাতে এই দুই জনের একই মূলগত মন কত বিভিন্ন মতে পরিবর্তিত হয়েছে, তা দেখা যেতে পারে।

ফ্লাউড্ কমিশনের রিপোর্ট বেরুল। দপ্তরখানায় তার গবেষণা হ'ল দেড় বছর। সেদিন আইনসভায় আলোচনা হ'ল গবেষক গার্ণার সাহেবের রিপোর্ট। সমস্ত ব্যাপারটা আজ এতই হাস্যকর যে তা নিয়ে বেশি আলোচনা ক'রে লাভ নেই। ফ্লাউড্ কমিশন বেশ বুঝেছিল —সমস্যার সমাধান করতে আজ বাংলার নূতন ক্ষমতাবান্ মধ্যবিত্তেরা চান না ; তাঁরা চান সমস্যাটা ধামা চাপা দিতে। তাই কমিশনের প্রস্তাবও হয়েছে তেমনিতর : 'জমিদারী প্রথা নিয়ে আপত্তি ? সে আপত্তি তো অমূলক নয় ; সরকারের ঢের টাকা ক্ষতি হচ্ছে। বেশ, তোমরা কৃষকেরা এসো, আমাদের খাসমহলের প্রজা হও, (অবশ্য সবাই তা হতে পারবে না, বর্গা জমি মালিকদেরই থাকবে) ; আমাদের খাজনা ঠিক এখন-কার হারেই দাও। আর জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী, তোমাদেরই বা ভয় কি ? তোমরা জমির আয়ের দশ-বিশগুণ পাবে ক্ষতিপূরণ। বাস্, ক্যাশ্ সার্টিফিকেট কিনেও ঘরে ব'সে খেতে-পরতে পাবে ; বরং জমিদারীর আদায়-উশুলের হুজ্জোত পোহাতে হবে না। তাতেও যদি আপত্তি হয়,—বেশ, নাই-বা তুললে জমিদারী প্রথা—একটা আয়করের ব্যবস্থা ভাবা যাবে।'

আইন-সভায় এর আলোচনা কালেও তাই, শুধু একটা লোক-দেখানো ব্যাপারই হ'ল। জমিদাররা অধিকাংশেই মোটা ক্ষতিপূরণ পেলে জমিদারী তুলে দিতে এই মুহূর্তে রাজী। কিন্তু বাজার খারাপ করা চলে না। তাই, একদল জমিদারী প্রথার মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন, 'জমির কি উপকার না করেছি আমরা !' আর দল কীর্তন করলেন নিজেদের মাহাত্ম্য : 'কৃষকের জন্য ছেড়ে দিচ্ছি জমি ; তবে চাই

বিশগুণ ক্ষতিপূরণ।' রাজনৈতিক দলের অগ্রগামিতাও আজ সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠল: একদিন যাঁরা জমিদারী প্রথার স্বপক্ষে ছিলেন আজ তাঁরা বললেন, 'চাই—কম্যুনিজম্, আর জমিদারদের দশগুণ-পনেরগুণ যা হয় কম্পেন্সেশন'।

এই 'কম্যুনিজম্ প্লাস্ কম্পেন্সেশন নীতি' আমাদের বাংলা দেশের কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিক আচ্ছন্ন মনের পরিচায়ক। আমরা বেশ বুঝেছি, আমাদের রাষ্ট্রনীতির মূলে মাটি নেই। সেই প্রয়োজনেই আমরা মাটির কুঁড়ের মানুষদের খোঁজ নিচ্ছি,—না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু সেখানে এগুতে গিয়ে দেখছি—আমাদেরই এই 'ভদ্রলোক'-জীবনযাত্রার আকাশ-প্রাসাদ একেবারে আকাশে মিলিয়ে যায়। তাই সংকট জেগেছে আমাদের মনে। সেই সংকট থেকে কেউ উদ্ধার পেতে চাই—নিজেদের Trusteeship-এর 'মর্যালকোড্' তৈরী ক'রে:—'অভাগাদের ভাবনা কি; আমরাই তো আছি তাদের উৎপন্ন ফসল ও পণ্যের 'ট্রাষ্টি'! ওরা ততক্ষণ নাহয় চরকা কাটুক; আরও দু' পয়সা তাতেও তো ওদের আয় হবে।' আর কেউ আমরা, যাঁরা বেশি অগ্রসর, বলি:—'কম্যুনিজম্ প্লাস আমাদের কম্পেন্সেশান।'

কিন্তু এদিকে আমাদের সংকট থেকে ত্রাণ দেবার জন্যেই দুয়ারে এসে পড়েছে কঠিনতম সংকট। এই যুদ্ধের ফলাফলে তা আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল—আজ আর পাটের, তুলার, চায়ের, আখের চাষীর উপায় নেই। আজ আর তেল লবণ দেশলাই'র দর বেঁধে রাখা যাচ্ছে না। ভারতবর্ষের সমস্ত কৃষিভিত্তিক সমাজ ও তার কৃষি-সংস্কৃতি এবার ধ'সে পড়ছে—ধ'সে পড়বেও। এ সত্য আজ হয়ত বোঝা শক্ত নয়, তবু স্বীকার করা কঠিন।

বাংলার শিক্ষিত-সাধারণ এই সত্যকে এবার প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হচ্ছে—যে সত্যের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের একদিন মুখোমুখি

ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রিয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত সুধী প্রধানের এই গ্রন্থ সেই সত্যেরই ভূমিকাপত্র—কঠিন তথ্য এর উপজীব্য; পদে পদে ওর নজির ও প্রমাণ; আর সম্মুখের কঠিনতম 'কিষাণ বিপ্লব' ওর প্রাণ। ভারতীয় কিষাণ-সাধারণের পক্ষ হতে আমরা তাই লেখককে জানাচ্ছি সহযাত্রী বন্ধুর অভিনন্দন।

নিখিল ভারত কিষাণ সভা
২৪৯-ডি, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২০।৯।৪

গোপাল হালদার

নিবেদন

এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদের অধিকাংশই পাটনার 'প্রভাতী'-তে 'কৃষি-সঙ্কট' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রভাতী'র সম্পাদক মহাশয়কে সে জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাবার আরো পাত্র ছিল—কিন্তু দুঃখের বিষয় সে অধিকারে বঞ্চিত হয়েছি। প্রকাশক মহাদেব সরকার ও সমবায় প্রেসের কর্মীরা পুস্তকখানিকে সুন্দর করবার জন্য যে গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করেছেন, তা বেশি ক'রে বলা সম্ভব নয়। এই ধরণের তথ্যপূর্ণ রচনায় প্রকাশভঙ্গি ও শব্দচয়নে সরকার মহাশয়ের যে সহযোগিতা পেয়েছি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আর, নিখিল ভারত কিষাণ সভার সাধারণ সম্পাদক শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার মহাশয় ভূমিকা লিখে দিয়ে এই ক্ষুদ্র রচনাকে যে মূল্য দিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যে জন্য ও যাদের জন্য এই রচনা লেখা, সর্বসাধারণ পাঠকের মন সেই দিকে কিঞ্চিত আকৃষ্ট হ'লেই আমার শ্রম সার্থক মনে করবো। ইতি—

অক্টোবর—১৯৪১
তিস্তারেখা—তাগদা
দার্জিলিঙ্

—গ্রন্থকার

শিউলি, আশা-বৌদি ও মা-লক্ষ্মীকে-

সূচী

প্রথম পরিচ্ছেদ

কৃষিকার্যের দুঃসঙ্কট

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁর "ভারতের ভূমি সমস্যা" শীর্ষক বই-এ বলেছেনঃ কৃষকের বর্তমান দুরবস্থার মধ্যে কৃষি বিপ্লবের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতের কৃষক জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুর্দশা জগতের মধ্যে অন্যতম নিদারুণ ঘটনা। পূর্বোক্ত বিখ্যাত বই-এ রাধাকমলবাবু বলেছেনঃ "অত্যন্ত সামান্য সম্বল নিয়ে ভারত-বর্ষে কৃষকদের কাজ চালাতে হয়। আর আমরা যদি কৃষকদের-সুখ সুবিধার কথা বিবেচনা করি তাহ'লে দেখবো এই সামান্য সম্বলও সকলের ভিতর সমান ভাবে বাঁটা হয় না। গত পঞ্চাশ বৎসরের ভূমিস্বত্ব ও কৃষক-সমস্যা বিচার করলে দেখা যাবে—বাঁটোয়ারা ব্যবস্থার এই অসাম্য ক্রমেই চরমে উঠছে। একদিকে ছোট ছোট ভূম্যধিকাঁরীর অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে—অপর পক্ষে জমিদার ও জমিহীন কৃষকদের মধ্যে এবং ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন স্তরের বিত্তভোগী ও শ্রমভারে পীড়িত ভূদাসদের মধ্যে অস্বাভাবিক পার্থক্য আমাদের

কৃষি-ব্যবস্থার ইতিহাসে এক সঙ্কটময় অবস্থা সৃষ্টি করেছে।
…ভারতের নানা অংশে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী চেতনার যে অস্পষ্ট গুঞ্জন ইতিপূর্বেই সুরু হয়ে গেছে তা বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থাকে প্রকাশ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছে।” (৪ পৃষ্ঠা)

এই কথাগুলি বলার পর অধ্যাপক মুখার্জী সিদ্ধান্ত করেছেনঃ “বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে ক্রমশ এই ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে যে, ভারতের ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যক। এই ধারণা সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। জমির উপর নির্ভরশীল লোকের অত্যন্ত সংখ্যাধিক্যে জমিগুলি এমন ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হচ্ছে যে এই সব খণ্ডে একটী কৃষক পরিবারের সমস্ত শ্রম ব্যবহৃত হতে তো পায়ই না পরন্তু—গ্রাসাচ্ছাদনের হার এত নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও একটী পরিবারের তা’তে কুলায়ও না। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে জমিদাররা কেবল খাজনা নেওয়ারই মালিক—ধনসম্পদের উৎপাদক নন; সেকালে কৃষি-যৌথে তাদের যে সম্মানজনক কর্তব্য ছিল—তার থেকে তারা বিদায় গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে জমিদার কৃষকদের কৃষিকার্যের পুঁজির যোগান দেন না বা কৃষিকার্য পরিচালনা করেন না। অথচ বর্তমান ভূমি-ব্যবস্থার গোলমেলে নিয়ম-কানুনের সুযোগ নেবার জন্য জমিদারের নিম্নে একদল মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি হয়েছে যারা প্রকৃত কৃষকদের দুরবস্থাকে আরো সঙ্গীন ক’রে তুলেছে।

এই কথাগুলি প্রকৃত ঘটনার সংক্ষিপ্তসার,—সমালোচনা নয়। পূরাণো ব্যবস্থা ভেঙ্গে-চুরে গেছে এবং তার পরিবর্তে বর্তমান সমাজ ও কৃষি জীবনের অবস্থা ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে।”

ভারতের কৃষি-সমস্যা যারা আলোচনা করেন তারা সকলেই এই মন্তব্যে সাধারণ ভাবে সম্মতি জানান। কিন্তু যখনই প্রশ্ন করা যায়, এই পরিবর্তনের ধরণ কী —এবং কী ভাবেই বা তা সাধন করা যাবে—তখনই বিদেশী শাসনে শাসিত ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমস্যাগুলি চোখে ভেসে ওঠে। কারণ বিদেশী শাসন যে ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—যে সমাজব্যবস্থা ভারতবর্ষের অগণিত জনসাধারণের টুঁটি টিপে হত্যা করতে উদ্যত—সে সমাজব্যবস্থার মূল রয়েছে কৃষি-সমস্যায়, ভূমি সম্পর্কের জটিলতায়। আর ঠিক সেই একই কারণে এই সব অব্যবস্থার মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছে আগামী পরিবর্তনের প্রচণ্ড চালক শক্তি—যা বর্তমানের অব্যবস্থাকে খতম ক'রে নয়া ব্যবস্থার রাস্তা পরিষ্কার ক'রে দেবে ব'লে শক্তি যোগাচ্ছে।

অবশ্য, এদেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা ও বর্তমান সমাজের শ্রেণী বিভাগের হিসাব না ক'রে পৃথক ভাবে এদেশের কৃষি-সমস্যা আলোচনা করা চলে না। এবং এই দুই অচল ব্যবস্থাকে চালু ক'রে রাখার দায় এবং সুবিধা দুই-ই সাম্রাজ্য-বাদের—সে কথাটাও মনে রাখতে হবে। ১৯২৬ সালে কৃষি

বিষয়ক রাজকীয় কমিশনকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, কমিশন গ্রামস্থ লোকদের ও কৃষির উন্নতির বিষয়ে কোনো কিছু সুপারিশ করতে পারে বটে কিন্তু বর্তমান ভূমিস্বত্ব, প্রজাস্বত্ব, করধার্য বা জলনিষ্কাশনের কর সম্পর্কে কোনো কথা তাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হবে না। এ যেন রামশূন্য রামায়ণ! জমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা না করলে কৃষি-উন্নতির কোনো সমস্যারই আলোচনা সম্ভব নয়। —অথচ সেইটাই রাজকীয় কমিশনের আমলে রইল না!

যাহোক, বর্তমান কৃষি-সঙ্কটের মূলে যে প্রাথমিক সমস্যাগুলি রয়েছে—আগে তার একটা খসড়া ক'রে নেওয়া যাক। সেগুলি হচ্ছে ঃ

১। জীবিকার্জনের অন্যান্য পথ রুদ্ধ থাকায় কৃষিকার্যে জন সংখ্যার অতিরিক্ত ভিড়।

২। জমি একচেটে ক'রে রাখা এবং কৃষকের কাঁধে সমস্ত বোঝা চাপানোর ফলাফল।

৩। অনুন্নত উপায়ে কৃষিকার্য চালনা এবং উন্নত ব্যবস্থার বাধা-বন্ধক।

৪। ইংরাজ-শাসনে কৃষির দুরবস্থা ও অচল অবস্থা।

৫। কৃষকের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, জমিগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করণ, ও কৃষককূলের বিরাট অংশকে ভূমিহীন করা।

৬। ফলে কৃষকদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শ্রেণী-বিভাগ

—কৃষককূলের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকই আজ ভূমিহীন সর্বহারা।

কৃষক-সমস্যার কোনো বিহিত করতে হ'লে এই আলোচনার ভিত্তিতেই শুধু সমাধান করা চলে—অন্যথায় কোনো কিছুই হবে না।

কৃষিকার্যের উপর অত্যধিক চাপ

'ভারতবর্ষ গ্রাম ভিত্তিক মহাদেশ'—এ কথা তারাই আশার সঙ্গে ব'লে বেড়ান যারা ভাবেন, শুধু এই বুলির মারফতেই তারা প্রমাণ ক'রে দেবেন—ভারতে গণতান্ত্রিক বা সামাজিক বিকাশের পথে কত বাধা। ভারতের জনসংখ্যার অধিকাংশ কৃষির উপর নির্ভর করে এবং পশ্চিম ইউরোপের জনসংখ্যার অধিকাংশ নির্ভর করে অতি উন্নত ধরণের নানা শিল্প-ব্যবসার উপর—। এই ঘটনাকে প্রাকৃতিক ঘটনা ব'লে অত্যন্ত মামুলিভাবে চালানোর চেষ্টা হয় এবং বলা হয় যে, ভারতের এই অনুন্নত সমাজব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে হ'লে অত্যন্ত সতর্কতা আবশ্যক। ১৯১৮ সালের বিখ্যাত মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টের গোড়ার কথায়—"ভারতের অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই মামুলী দোহাই পাড়ার একটা নজির দেখাচ্ছিঃ "জনসাধারণের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি কার্য। স্বাভাবিক সময়ে ইংলণ্ডের মতো শিল্পপ্রধান দেশে জনসংখ্যার শতকরা ৫৮ ভাগ শিল্পে এবং ৮ ভাগ কৃষিতে

নিযুক্ত থাকে---কিন্তু ভারতে শতকরা ৭১ ভাগ লোকই কৃষি কার্যে নিযুক্ত। সমস্ত ভারতবর্ষের সাড়ে ৩১ কোটী লোকের সাড়ে ২২ কোটী জমির উপর নির্ভর করে এবং বিশ কোটী লোক প্রত্যক্ষ ভাবে নিজের বা পরের জমির উপর কৃষি-কার্যের সাহায্যে বা কৃষির উপর নির্ভর ক'রে তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ক'রে থাকে।")

১৯৩০ সালের সাইমন কমিশনের রিপোর্টও এই কথাগুলি উদ্ধৃত ক'রে অত্যন্ত আশান্বিত ভাবে সিদ্ধান্ত করেছে যে যদি কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হয় তো তা—'অত্যন্ত ধীরে ধীরে' হবে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, "কৃষকের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে আছে জল বায়ু, ফসল আর গোরু বাছুরের উপর; একদিকে পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব আর মেলা, আর-একদিকে দুর্ভিক্ষ ও বন্যার ভীতি,---এই হচ্ছে মান্ধাতার আমল থেকে কৃষকের চিন্তার বিষয়। এই চিরাচরিত ব্যবস্থা থেকে তাদের দৃষ্টি বাড়িয়ে তোলা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার গতিবেগ বাড়ানো—খুব সহজে হবে না। অতি ধীরে চলতে হবে।"

শিল্পপ্রধান পশ্চিম-ইউরোপীয় দেশগুলির সঙ্গে কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের যে পার্থক্য আছে—তা সত্য! কিন্তু এই সত্য প্রচার করার সময় যখন সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় না—তার মূল শক্তির হিসাব-নিকাশ এড়িয়ে চলা হয়—তখন এটা বিকৃত সত্যের

রূপ ধরে, মিথ্যা প্রচার হয়ে যায়। —এবং ঠিক সেই জন্যই সিদ্ধান্তগুলিও ভুল হয় কারণ কৃষি-সঙ্কটের তীব্রতাই ভারত-বর্ষের যে-কোনো দ্রুত ও গুরুতর পরিবর্তনের চরমতম বিপ্লবী শক্তি।

কিন্তু পূর্বোক্ত সরকারী ঘোষণাগুলিতে যে সত্য বিকৃত হয়েছে—যে সত্যকে দূরে রাখা হয়েছে—তা হচ্ছে এই যে, জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশকে যে একেবারে কৃষিকার্যের উপরই ভরসা ক'রে থাকতে হয়—যার ফলে এদেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার মূলে সাঙ্ঘাতিক রকমের অসাম্য ও অপব্যয় সৃষ্টি হয়েছে—এ ব্যাপারটা ভারতবর্ষের সেকেলে সমাজব্যবস্থার একেলে ফল নয়—বরং এ ব্যাপারটা অত্যন্ত আধুনিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের প্রত্যক্ষ ফল। এ দেশের শিল্পব্যবসা ও কৃষিকার্যের মধ্যে যে সাম্য ছিল—তাকে ব্যাহত ক'রে —শিল্প ধ্বংশ ক'রে জনসংখ্যার অধিকাংশকে কৃষির উপর নির্ভর করিয়ে ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের কৃষিক্ষেত্র রূপে পরিণত করা ইংরেজ-শাসনেরই কীর্তি।

গত পঞ্চাশ বৎসরের সেন্‌সাস্‌ আলোচনা করলে এই ছবি স্পষ্ট বোঝা যাবে এবং তার আগেকার সেন্‌সাস্‌ যদি পাওয়া যেত তাহ'লে এই ধ্বংশলীলার বিবরণে অভিভূত হতে হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চতুর্থ অংশের মধ্যেই ভারতীয় শিল্পের প্রধান ক্ষতি করা হয়ে গিয়েছিল, জনবহুল শিল্পকেন্দ্র-গুলিকে ধ্বংশ করা হয়েছিল—সেই সকল জনসংখ্যাকে গ্রামে

বিতাড়িত করা হয়েছিল ও লক্ষ লক্ষ গ্রাম্য কারিগরদের পেশা নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছিল। এই সময়কার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না—কিন্তু এর পরের আদমসুমারী ঘাঁটলে দেখা যায় যে, এই দুষ্কর্ম—ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

১৮৮১ সালে প্রথম সেন্সাস্ গ্রহণ করা হয়। অবশ্য এই সেন্সাস্টা খুব ভালো রকম হয়নি এবং এর সাহায্যে তুলনা করাও বিপদজনক। এগারোকোটী পঞ্চাশলক্ষ শ্রমরত জনগণের মধ্যে পাঁচকোটী দশলক্ষ কৃষিকার্যে রত ব'লে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—শ্রমরত জনগণের অর্ধেকেরও কম সংখ্যা কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল —কিন্তু এটা বিশ্বাস করা হয়তো কষ্টকর। যাই হোক পরের হিসাবগুলি দেখলে বোঝা যাবে:

সাল -		জনসংখ্যার শতকরা কৃষিকার্যে নিযুক্ত —
১৮৯১	...	৬১·৬
১৯০১	...	৬৬·৫
১৯১১	...	৭২·২
১৯২১	...	৭৩·০

১৯৩১ সালে এমন ভাবে শ্রমরত জনসাধারণের শ্রেণী-বিভাগ করা হ'ল যাতে সেন্সাসে প্রকাশ পায় যে জনসংখ্যার শতকরা ৬৫·৬ ভাগ কৃষিকার্যে নিযুক্ত। কিন্তু এটা কাগজেই বলা হ'ল—আসল অবস্থা একটুও বদলায়নি। সরকারপক্ষীয় বিখ্যাত অর্থনীতিবেত্তা অ্যান্‌ষ্টে তাঁর "ভারতের অর্থনৈতিক

বিকাশ” নামক বই-এর ৬১ পাতায় বলেছেন: “১৯১১ সাল থেকে ১৯৩১ সালের সময়কার সেন্সাসে কৃষিকার্যে নিযুক্ত জনসংখ্যার হার যে হঠাৎ ক’মে গেল ব’লে প্রকাশ পাচ্ছে —সে প্রকাশটা বিকৃত, বঞ্চনাপ্রবণ। লোকের পেশা বদলায়নি —বদলেছে রিপোর্ট-ভুক্ত করার কায়দা। ১৯২১-৩১ সালের মধ্যে কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যার কোনোরকম পরিবর্তন হয়নি।” ১৯৩১ সালের ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটির তদন্তের ৩৯ পৃষ্ঠায় এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে- “ভারতে কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যাই বেশি এবং ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। ১৮৯১ সালে ছিল শতকরা ৬১ জন, ১৯০১-এ দাঁড়াল ৬৬, ১৯২১-এ বেড়ে হ’ল ৭৩। এখনও ১৯৩১ সালের সেন্সাসের খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় সংখ্যা আরও অনেক বেড়েছে।”

যাই হোক, যদি ১৯৩১ সালের সরকারী হিসাবও (৬৬.৬) মেনে নেওয়া যায়, তাহ’লেও দেখা যায় ১৮৯১ সালের সংখ্যা (৬১.১) থেকে তা বেড়ে গেছে।

কেন এমন হ’ল—তার উত্তর ১৯১১ সালের একজন সেন্সাস কমিশনার দিচ্ছেন –; তিনি লিখছেন: “সস্তা বিদেশী কাপড়চোপড় ও বাসনকোসনের পর্যাপ্ত আমদানী এবং এদেশে বিলাতী কায়দায় ফাঁদা কলকারখানা এখানকার গ্রামের শিল্পকে ধ্বংস করছে। কৃষিজাত ফসলের দাম বেড়ে যাওয়ায় গ্রামের কারিগররা তাদের পেশা ছেড়ে কৃষিকার্য

অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে গ্রামে যে ভাঙ্গন ধরেছে তা অবশ্য সব প্রদেশে সমভাবে হয়নি। যে প্রদেশগুলি পাশ্চাত্যভাবে যত পরিমাণে উন্নত সেই প্রদেশগুলিতেই এটা সেই পরিমাণে প্রকাশ পাচ্ছে।”

১৯১১ সালের পর শিল্প থেকে লোক বিতাড়িত হয়ে শুধুমাত্র কৃষিকার্যে নিযুক্ত হতে বাধ্য হওয়ার সংখ্যা তীব্র ভাবে বাড়তে থাকে। ১৯১১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে যে ক্ষেত্রে মোট জনসংখ্যার তিন কোটী আশীলক্ষ বেড়ে গেল—সে ক্ষেত্রে শিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যার মোট অংশ থেকে পরিষ্কার বিশ লক্ষ লোক ক’মে গেল।

সাল —		জনসংখ্যার শতকরা শিল্পে নিযুক্ত—
১৯১১	...	৫.৫
১৯২১	...	৪.৯
১৯৩১	...	৪.৩

১৯১১ থেকে ১৯৩১ এই বিশ বছরে যে জনসংখ্যার শতকরা ১২ অংশ বেড়ে গেল—সেই সময় শিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যা শতকরা ১২ অংশ ক’মে গেল। এতেই বেশ বোঝা যায় যে এদেশীয় শিল্পের বিনাশ সাধন ক’রে তার পরিবর্তে আধুনিক শিল্প প্রবর্তন না করিয়ে জনসংখ্যাকে কি নির্মম ভাবে কৃষিকার্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ফসল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে—তার যায়গায় বহু অ-খাদ্য অথচ অন্যভাবে

প্রয়োজনীয় ফসলের উৎপাদন বেড়ে গেল। ১৮৯২-৯৩ সালে এবং ১৯১৯-২৯ সালে আঠারো কোটী সোত্তর লক্ষ একর জমি থেকে একুশ কোটী হ'ল (এক একরে প্রায় তিন বিঘা) অর্থাৎ শতকরা সাত ভাগ বাড়ল খাদ্যোৎপন্নের ব্যবহৃত জমির পরিমাণ—অপর পক্ষে অন্যান্য ফসলের জন্য তিনকোটী থেকে চারকোটী তিরিশ লক্ষ একর জমি বেশী ব্যবহৃত হ'ল—অর্থাৎ শতকরা ৪৩ ভাগ বাড়ল (ওয়াদিয়া ও যোশী—"ভারতের সম্পদ")। এই ব্যাপার ক্রমে বাড়তে থাকে। ১৯১০-১১, ১৯১৪-১৫ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে গড়ে ৫ বছরে খাদ্যশস্যের জমি শতকরা ১২ বৃদ্ধি হয়েছে এবং অন্যান্য শস্যের জমি শতকরা ৫৪ বেড়েছে। ১৯০০-১ সালের কাঁচা তূলার রপ্তানি ছিল ১৭৮০০০ টন (এক টনে প্রায় ২৮ মণ), সেটা ১৯৩৪-৩৫ সালে ৬১৫০০০ টন হয়েছে অর্থাৎ শতকরা ২৪৫ বেড়েছে। ঐ সময়েই চা রপ্তানী ১৯ কোটী থেকে বেড়ে বত্রিশ কোটী চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড হয়েছে এবং তেলের বীজ ৫৪৯০০০ টন থেকে ৮৭৪০০০ টন রপ্তানী হয়েছে।

বৃটিশ পুঁজিদাররা ভারতকে কাঁচা মালের উৎপাদক ও বিলাতী শিল্পজাত জিনিষের খরিদদার বানিয়েছে। এই মৎলব-বাজীর প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ কৃষিকার্যে লোকের ভিড় যত বাড়তে লাগল— রপ্তানীর চাহিদায় অ-খাদ্য শস্য উৎপাদনের তাগিদও তত বেশি হ'ল এবং খাদ্যাভাবে ভারতীয় জনগণের অনাহারের মাত্রা সেই অনুপাতে বেড়েই গেল।

কৃষিকার্যে লোকের ভিড় বাড়ছে—আবার এই লোকগুলির (কৃষকদের) উপরই সমাজের সকল রকম শোষণ চলছে—ভারতের দারিদ্র্যের মূল এইখানে। কেননা বৃটিশ পুঁজিপতিদের কল্যাণে এই কৃষকদের চাষবাসের প্রথা সেকেলে ছোট ছোট ক্ষেত-খামার ছাড়িয়ে তো একপাও এগোতে পায় নি--টুকরো টুকরো জমি আর মান্ধাতার আমলের হাল-লাঙ্গল এত চাপ সইবে কেন? ১৮৮০ সালে সরকার নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ কমিশন একথা স্বীকার ক'রে বলেছে: "দুর্ভাগ্য বশত এদেশের অধিকাংশ লোকেরই অবলম্বন কৃষিকার্য---এই হ'ল ভারতের জনগণের দারিদ্র্য ও সাময়িক অন্নাভাবের প্রধান কারণ।"

একশো বছর আগে ১৮৪০ সালে হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটিতে স্যর চার্লস্ ট্রেভেল্যান বলেছেন: "আমরা ভারতের শিল্পজাত উৎপাদন নষ্ট ক'রে দিয়েছি; কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো অবলম্বন তাদের নেই।"

একশো বছর পরে ১৯২৮ সালে কৃষি সম্পর্কীয় রাজকীয় কমিশন এই দুঃখের কাহিনীরই পুনরুল্লেখ করেছে: "জমির উপর লোকের ভিড়, জীবনধারণের অন্য উপায় না থাকা বা যা আছে তাও পাওয়া কষ্টকর এবং অল্প বয়সেই বড় পরিবার পালন করতে হয় ব'লে কৃষকেরা যে-কোনো সর্তে যে-কোনো জায়গায় ফসল উৎপন্ন করতে রাজী হয়ে যায়।" (Royal Commission Report, 1928, ৪৩৩পৃঃ)

কৃষির উপর অত্যধিক চাপের ফল

কৃষিকার্যে অতিরিক্ত লোকের আমদানীর অর্থই হচ্ছে, ভারতবর্ষের বর্তমান অনুন্নত কৃষি-ব্যবস্থার উপর এদেশের ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ক্রমবর্ধমান চাপ দেওয়া।

কিন্তু বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থা এই চাহিদাকে পূরণ করতে অক্ষম —কেননা জমির মালিকানা জমিদার গোষ্ঠির একচেটিয়া হওয়ার ফলে জমির উন্নতি তাদের মর্জির উপর নির্ভর ক'রে রয়েছে এবং তাদের সঙ্গে অধোগতির পথে চ'লে গেছে ; আর হরেক রকম শোষণের প্রধান পাত্র হওয়ার ফলে কৃষক সম্প্রদায় আজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

এই সর্বনেশে গোলক-ধাঁধা এদেশের কৃষি-ব্যবস্থাকে বন্দী ক'রে ফেলেছে এবং ক্রমবর্ধমান কৃষি-সঙ্কটের ভিতরের কথাই হ'ল এই। আর দেখা যাচ্ছে যে, কৃষির উন্নতিই সুধু স্থবির হয়নি, কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণও ক'মে যাচ্ছে এবং চাষীদের দুরবস্থা যুগান্তকারী হয়ে উঠেছে। জমির উপর যত লোকের আমদানী হচ্ছে—প্রত্যেকটী চাষীর ভাগে চাষের জমি ততই ক'মে আসছে।

স্যর টমাস হোল্ডরনেস্ ১৯১১ সালে লিখেছেন ঃ "করদরাজ্য সমেত ভারতের জনসংখ্যা সাড়ে একত্রিশ কোটী। এই বিরাট জনসংখ্যার ৩/৪ অংশ কৃষির উপর নির্ভর করে। চাষবাসের জমি কত তা ঠিক জানা যায় নি কারণ করদরাজ্যগুলির হিসাব

ঠিক নেই। তবে চাষীর মাথা পিছু চার বিঘা জমি আছে—এই হিসাব ধরলে বেশি ভুল হবে না। —এই জমি শুধু খাদ্যই যোগান দেয় না, এর অনেকখানি অংশ রপ্তানী ফসল উৎপন্ন করে।— প্রকৃতপক্ষে কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ দাম দ্বারা ভারতে আমদানী জিনিষের দাম দেওয়া হয় ও নানারকমের বৈদেশিক ঋণ শোধ করা হয়। এই সব প্রয়োজন মেটাবার জন্য জমির যে অংশ ব্যয় হয় সেটা বাদ দিলে দেখা যাবে – কৃষকের নিজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য মাথাপিছু দুই বিঘা জমি মাত্র থাকে। অর্থাৎ ভারতের চাষীর সারা বছরের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মাত্র দুই বিঘা জমি মাথাপিছু! জগতে সম্ভবত আর কোনো দেশ নেই যেখানে জমিকে এতটা দায় বহন করতে হয়।" (সার টমাস হোল্ডর-নেসের "ভারতের জনগণ ও তার সমস্যা" ১৯১১ সাল—১৩৯পৃঃ)।

১৯১৭ সালে বোম্বাই সরকারের কৃষি বিভাগের কর্তা ডাঃ হ্যারল্ড এইচ ম্যান্ পুণার একটী সাধারণ গ্রামের অবস্থা অনুসন্ধান ক'রে নিম্নলিখিত ফল প্রকাশ করেন :—

সাল	…	চাষীর মাথাপিছু গড়পড়তা চাষের জমি
১৭৭১	…	১২০ বিঘা
১৮১৮	…	৫২-১/২ ,,
১৮২০-৪০	…	৪২ ,,
১৯১৪-১৫	…	২১ ,,

এই অনুসন্ধানের ফলে এটাও প্রকাশ পেয়েছিল যে, এই সকল জমির শতকরা ৮১ ভাগই অত্যন্ত ভালো

অবস্থাতেও তাদের মালিককে পুষতে পারে না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন ঃ

"গত ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে জমির পরিমাণ যে কী ভাবে ক'মে এসেছে তা এর থেকে বেশ বোঝা যায়। বৃটিশ শাসনের আগে এবং অব্যবহিত পরে জমিগুলি বেশ বড় ছিল— অধিকাংশ ক্ষেত্রে ২৫/৩০ বিঘা ছিল এবং ৬ বিঘার কম কোনো টুকরো জমিই ছিল না। বর্তমানে জমির সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু তাদের শতকরা ৮১ ভাগই পরিমাপে ৩০ বিঘার কম এবং শতকরা ৬০ ভাগ জমি ১৫ বিঘার কম।" (ডাঃ এইচ. এইচ. ম্যান্—"দাক্ষিণাত্যের একটী গ্রামের কৃষক ও মজুর", ভল্যুম এক, ১৯১৭, ৪৮ পৃঃ)

অন্যান্য প্রদেশের অনুসন্ধানের ফলও এই একই রকম।— —"মিঃ কিটিংস মন্তব্য করেছেন, বোম্বাই প্রদেশের জমি-জমার অবস্থা এমন ক'রে আনা হয়েছে যে, সেখানে চাষ-বাস করা অসম্ভব; এবং ডাঃ শ্লেটারও মাদ্রাজ সম্পর্কে এই মন্তব্য সমর্থন করেছেন। অন্যান্য প্রদেশেও ঠিক এই অবস্থা।" —(সরকারী কৃষি কমিশনের রিপোর্ট, ১৩২ পৃঃ)

১৯২১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে বিভিন্ন প্রদেশে গড়-পড়তা চাষীর মাথাপিছু চাষের জমির হিসাব এই রকম ঃ—

বোম্বাই—৩৬·৬, পাঞ্জাব—২৭·৬, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—২৫·৫, বর্মা—১৬·৮, মাদ্রাজ—১৪·৭, বাংলা—৯·৩, বিহার ও উড়িষ্যা—৯·৩, আসাম—৯·০, এবং যুক্তপ্রদেশ—৭·৫ বিঘা।

এই হিসাবের মধ্যে একটা জিনিষ লুকানো আছে সেটা হচ্ছে এই যে, অল্পসংখ্যক লোকের বড় বড় জমি 'অধিকাংশ লোকের ছোট ছোট জমির হিসাবের সঙ্গে গড়পড়তা হিসাবটা ভারী করেছে। আসলে অধিকাংশ লোকের জমির আকার পূর্বোক্ত অঙ্কগুলির কম।

বোম্বাই-এর প্রাদেশিক সমবায় সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা ('কঙ্কণ গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র' Rural Economics series No. 3) থেকে জানা যায় যে, কঙ্কণ গ্রামে ৫৭৬ বিঘা চাষের উপযুক্ত জমি আছে; তার মধ্যে ৩৩৯ বিঘা জমি এমন ২৪ জন লোকের অধিকারে আছে যারা চাষী নয়—অর্থাৎ তাদের মাথা পিছু ১৪·১৩ বিঘা জমি আছে। অপর পক্ষে ২৮ জন চাষীর অধিকারে আছে ১৩৪ বিঘা জমি. অর্থাৎ মাথা পিছু ৮·৫৫ বিঘা জমি।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক প্রকাশমালার দুই নম্বর পুস্তিকা—"একটী মালাবার গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন"-এ দেখা যায় যে এই গ্রামের শতকরা ৩৪ ভাগ জমির আয়তন ৩ বিঘারও কম। জমিতে যেসব চাষীর চিরস্থায়ী স্বত্ব নেই তাদের সম্পর্কে---অর্থাৎ অধিকাংশ চাষীর সম্পর্কেই সরকারী কৃষি কমিশন রিপোর্টের ১৩৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে:

"পাঞ্জাবের সংখ্যায় দেখা যায়, কৃষকরা তাদের সংখ্যার শতকরা সাড়ে বাইশ অংশ ৩ বিঘা কিম্বা তারও কম জমি চাষ করতে পায়; শতকরা সাড়ে পনর জন তিন থেকে ৬/৭

বিঘা, শতকরা ১৭·৯ জন ৭ থেকে ১৫ বিঘা এবং শতকরা সাড়ে বিশ জন ১৫ থেকে ৩০ বিঘা জমি চাষ করতে পায়। বোম্বাই ও বর্মা ছাড়া (বোম্বাই-এর ফল প্রায় এই রকমই এবং বর্মার গড়পড়তা জমি হয়তো একটু বেশি) অন্যান্য প্রদেশে চাষীর মাথা-পিছু চাষের জমির পরিমাণ এর থেকেও কম।”

তাহ’লে দেখা যাচ্ছে, অপেক্ষাকৃত ‘ধনশালী’ পাঞ্জাবের (পাঞ্জাব বৃটিশ শাসনে অপেক্ষাকৃত অল্পদিন এসেছে) এক-তৃতীয়াংশ চাষী ৭ বিঘার কম জমি পায় এবং অর্ধেক চাষী গড়পড়তা ১৫ বিঘা পায়।

১৯২১ সালে বাংলা দেশের আদমসুমারীতে প্রকাশ পেয়েছে যে চাষীর মাথা-পিছু ৬·৬ বিঘা জমি আছে। এই রিপোর্টই মন্তব্য করেছে, “কৃষকের দারিদ্র্যের কারণ জমির এই সব অঙ্কেই বোঝা যায়।”

এই ঘটনার তাৎপর্য সহজে এড়ানো সম্ভব নয়। জমির জন্য এই অশান্ত, অশ্রান্ত ও দুর্দমনীয় বুভুক্ষা ক্রমশ বেড়েই চলেছে—এই বুভুক্ষা শেষে ক্ষিপ্ততায় রূপান্তরিত হবে এবং তার পরিসমাপ্তির কথা ইতিহাসের এক পাতাতেই মেলে —আর সে হ’ল রাশিয়ার কৃষি-ইতিহাসের পাতা।

কৃষিকার্যের অবনতি ও অচল গতি

জমির জন্য এই চিরন্তন ক্ষুধা যে বেড়ে চলেছে তা কি জন-সংখ্যার অনুপাতে জমি কম আছে ব’লে?—এটা কি প্রকৃতির

অলঙ্ঘনীয় ব্যাঘাত ? অবশ্য অনেকের ধারণা তাই ! কিন্তু তথ্য যাচাই করলে দেখা যাবে, কথাটা তো সত্য নয়ই বরং তার উল্টাটাই সত্য।

লোকসংখ্যার অনুপাতে জমি কম নয়। পূর্বোক্ত সমস্যা হয়েছে দুই কারণে। প্রথম কারণ হ'ল—বর্তমানে চাষবাসের উপযোগী যেসব জমি আছে সেগুলি নানা আইনগত বাধা বিপত্তির ফলে অব্যবহার্য এবং যেখানে আইনের মারপঁ্যাচ নেই —সেখানেও জমিদারের উদাসীনতার ফলে জমিকে উন্নত করার চেষ্টার অভাব। দ্বিতীয় কারণ,—বর্তমান সমাজব্যবস্থা কৃষকের ঘাড়ে যেসব বোঝা চাপিয়েছে তার ফলে চাষবাসের যন্ত্রপাতিকে আধুনিক করতে না পারায় ও বৃহদাকারে চাষবাসের ব্যবস্থা না থাকায় জমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ অত্যন্ত কম।

হিসাব ক'রে দেখা গেছে, উপযুক্ত জলনিকাশের ব্যবস্থা করলে ও পূর্বোক্ত আইনগত বাধা উঠিয়ে দিলে এখনও যেসব জমি চাষোপযোগী আছে সেগুলি থেকে, বর্তমানের হাল-গরু সম্বলিত ছোটখাটো চাষের ব্যবস্থাতেই, চুয়াল্লিশ কোটী লোকের ভরণ-পোষণ চলতে পারে—অর্থাৎ বর্তমান জনসংখ্যা থেকেও ৯ কোটী লোক বেশি পোষা যায়। (রাধাকমল মুখার্জী—৪০ কোটী লোকের খাদ্য যোগানের পরিকল্পনা—২৬ পৃঃ)।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ আর, কে, দাস তাঁর "ভারতের শিল্প সামর্থ্য" নামক পুস্তকে হিসাব ক'রে দেখিয়েছেন ভারতবর্ষে চাষবাসের জন্য মোট যতটা পরিমাণ জমি পাওয়া যায়

তার শতকরা ৭০ ভাগ নষ্ট হয় এবং অবশিষ্ট ৩০ ভাগ মাত্র সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

"আদতে ফসল ফলানো হয় বাইশ কোটী আশি লক্ষ একর জমিতে—অর্থাৎ চাষোপযোগী জমির শতকরা ৫৩ ভাগে। কিন্তু যেসব জমিতে একবারের বেশি ফসল হয় সেগুলি যদি ফসল-পিছু পৃথক ক'রে হিসাব করা যায় তাহ'লে গড়ে মোট ২৬ কোটী ষাট লক্ষ একর জমি চাষ করা যায় ব'লে ধরতে হবে। জল বায়ুর ভালো অবস্থার দরুণ অধিকাংশ চাষোপযোগী জমি দুই ফসলের বেশিও দিতে পারে, আবার কিছু কিছু জমি আছে যা সারা বছরে একবারও ফসল দিতে পারে কিনা সন্দেহ। যাই হোক, গড়ে সমস্ত চাষোপযোগী জমিই দুই ফসলের উপযুক্ত—এই হিসাবে জমির পরিমাণ ছিয়াশী কোটী ৪০ লক্ষ একর। সে ক্ষেত্রে ২৬ কোটী বিশ লক্ষ অর্থাৎ ৩০ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে আর ৬০ কোটী বিশ লক্ষ অর্থাৎ ৭০ ভাগ প'ড়ে থাকছে।......"
——(আর, কে, দাস প্রণীত "ভারতের শিল্প সামর্থ্য"—১৯৩০, ১৩ পৃষ্ঠা)।

বস্তুত এই শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরে দেখা যায়, মন্দা বাজারের বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি হওয়ার আগেও চাষোপযোগী জমির মোট পরিমাণ জনসংখ্যার অনুপাতে বেড়েই চলেছিল। প্রমাণ স্বরূপ পরের পৃষ্ঠায় এই সংক্রান্তে একটা হিসাব দেওয়া গেল।

সময়	জনসংখ্যা	মোট ফসলের জমি	খাদ্য শস্যের জমি
যুদ্ধের পূর্বেকার বছর (১৯১০-১১ থেকে ১৯১৪)	১০০	১০০	১০০
১৯৩০-৩১	১০৭	১১৮.৬	১১৩.৯
১৯৩৪-৩৫	১২০	১১৭.১	১১২.৪

(অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জীর "২০ কোটীর খাদ্য যোগানের পরিকল্পনা" ১৬—১৭পৃঃ)। এই তালিকার সাহায্যে বোঝা যাচ্ছে, ১৯১০-১১ থেকে ১৯৩০-৩১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা শতকরা ৭ ভাগ বৃদ্ধি পেল—আর চাষের জমি শতকরা ১৮.৬ ভাগ বাড়ল; কিন্তু মন্দার বছরগুলিতে অর্থাৎ ১৯৩৪-৩৫ সালে দেখা যাচ্ছে মোট চাষের জমি কমেছে এবং খাদ্য শস্যের জমি আরও কমেছে।

এর থেকেও বড় কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমানে যতটুকুও বা চাষোপযোগী জমি আছে ততটুকুতেও পূরা চাষ করা হয় না। প্রচলিত সরকারী হিসাবের সংখ্যায় প্রকাশঃ

বৃটীশ ভারতে কৃষি-উপযোগী জমি—১৯৩৫-৩৬

সার্ভে কৃত মোট জমি	৬৬ কোটী ৭৪ লক্ষ একর
বন	৮ ,, ৯৫ ,, ,,
যেসব জমি কৃষিকার্যের জন্য পাওয়া যায় না	১৪ ,, ৫০ ,, ,,

কৃষি-উপযোগী পতিত জমি	১৫ কোটী ৩৬ লক্ষ একর
কৃষিকার্যের জন্য ফেলে রাখা জমি	৫ ,, ১০ ,, ,,
ফসল করা জমি	২২ ,, ৭৯ ,, ,,

—(Statistical Abstract of British India—1936)

—এই হিসাবের শেষ তিন দফায় মোট চাষোপযোগী ৪৩ কোটী ২০ লক্ষ একর জমির শতকরা মাত্র ৫৩ ভাগ ফসল করা হয়, প্রায় ১১ ভাগ ফেলে রাখা হয় এবং প্রায় ৩৫-১/২ ভাগ জমি পতিত থেকে যায়। আরো বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সরকারী হিসাবে 'কৃষি কার্যের জন্য পাওয়া যায় না' ব'লে সার্ভেকৃত মোট জমির যে এক-পঞ্চমাংশ আলাদা রেখে দেওয়া হয়েছে—সেই সমস্ত জমি সম্পর্কে সরকারী কৃষি কমিশন রিপোর্টে বলতে বাধ্য হয়েছে (৬০৫ পৃঃ) "কৃষিকার্যের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না এমন ১৫ কোটী একর জমি (অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের সমস্ত আয়তনের ২২-১/২ শতাংশ) যায়গা যে সত্যিই চাষের উপযোগী নয় বা চাষের কাজে পাওয়া যায় না—এ কথা বিশ্বাস করা বড় শক্ত।" আবার অন্যদিকে সরকারী হিসাবে স্বীকৃত চাষোপযোগী পতিত জমির পরিমাণ যে ৩৫-১/২ ভাগ নয়, তারও বেশি—অর্থাৎ সমস্ত জমির ২/৫ অংশ নিশ্চয় হবে,—এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে।

তারপর 'কৃষিকার্যের জন্য ফেলে রাখা' জমির এই বিরাট অংশটাই-বা কেন ফেলে রাখা হয়—কেন চাষবাস হয় না?

(অবশ্য এ প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এই জমির পরিমাণ সকল প্রদেশেই সমান নয়। ৬ কোটী একর অর্থাৎ ২/৫ অংশ বর্মা প্রদেশে,—আর বর্মা প্রদেশ তো ১৯৩৭ সাল থেকে বিচ্ছিন্ন। তবু বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের মত জনবহুল প্রদেশগুলিতে এই 'ফেলে রাখা চাষের উপযোগী জমির' পরিমাণ মোট জমির তুলনায় বড় কম নয়—যথা, বাংলায় শতকরা ১৮-১/২ ভাগ, বোম্বাই-এ ১৩-১/২, মাদ্রাজে ২৩ এবং যুক্তপ্রদেশে ২১-১/২ ভাগ।)

এ প্রশ্নের উত্তর ১৮৭৯ সালে ভারত সচিবের নিকট প্রদত্ত দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে সার জেমস্ কেয়ার্ড মন্তব্য দিয়েছেন : "সহজলভ্য ভালো জমি প্রায় সবই অধিকৃত। কিন্তু দেশের চারিদিকে বিস্তৃত ভালো পতিত জমি বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন রয়েছে—যা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে চাষের উপযোগী করা চলে। কিন্তু তার জন্য মূলধন দরকার—আর সে মূলধন জনগণের খুব কমই আছে।"

এই সমস্ত বিস্তৃত পতিত জমি তাহ'লে চাষোপযোগী করা সম্ভব, কিন্তু নিতান্ত গরীব চাষীদের, যাদের সামান্য উদ্‌বৃত্ত সম্পদ নানা ভাবে শোষণ ক'রে নেওয়া হয়, যাদের অধিকাংশই জীবনধারণের সর্বনিম্ন সুবিধাগুলি থেকেও বঞ্চিত তাদের দ্বারা এ কর্তব্য সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সরকারী সাহায্যে পুষ্ট চাষীদের সমবায় সংগঠন দ্বারা এই আশু কর্তব্য সমাধান সম্ভব এবং জাতির উদ্‌বৃত্ত সম্পদ এ

কার্যে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সরকার এই দায়িত্ব কখনও স্বীকার করেনি ; আর ঠিক এইখানেই বর্তমান শাসন- ও সমাজ-নীতির সব থেকে বড় ত্রুটি দেখা যায়। বৃটিশ শাসনের আগে অন্যান্য শাসনতন্ত্রে যতটুকু পূর্ত কার্য বা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল—বৃটিশ শাসনতন্ত্র সে ব্যবস্থাটুকুও অবহেলা করেছে এবং মরণাত্মক শোষণের ফলে চাষোপযোগী জমি পতিত হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য বর্তমানে জমিকে চাষোপযোগী করা বা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করার দিকে সরকারের সামান্য দৃষ্টি পড়েছে বটে– কিন্তু চাহিদা ও সম্ভাবনার দিক থেকে এ চেষ্টা একেবারেই তুচ্ছ। এই শাসনব্যবস্থা গোড়াতে যে-ভাবে এই কার্য অবহেলা করেছে তা কুখ্যাত হয়ে আছে এবং মার্ক্সের এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিবৃতিতে এই ব্যাপার উল্লিখিত হয়েছে ঃ

"অনাদি কাল থেকে এসিয়াতে তিনটী সরকারী বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। রাজস্ব বিভাগ অর্থাৎ স্বদেশ লুণ্ঠন, যুদ্ধ বিভাগ অর্থাৎ পরদেশ লুণ্ঠন এবং পূর্ত বিভাগ।...পূর্ব-বর্তীদের কাছ থেকে ইংরাজরা ভারতে রাজস্ব ও যুদ্ধ-নীতি গ্রহণ করেছে—কিন্তু পূর্ত বিভাগকে একেবারেই অগ্রাহ্য করেছে। এরই ফলে ভারতের কৃষির এই দুরবস্থা। বিলাতী কায়দায় স্বাধীনভাবে বেচা-কেনার নীতিতেও তাই এদেশের কৃষিকাজ চালানো সম্ভব নয়"। (মার্ক্স—'ভারতে ইংরাজ শাসন', নিউইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন, ২৫শে জুন, ১৮৫৩ সাল।)

১৮৩৮ সালে একজন বিদেশী দর্শক (G. Thompson, "India and the Colonies",1838) মন্তব্য করেছেনঃ "হিন্দু বা মুঘল রাজগণ দেশের সুখ সুবিধার জন্য যে সকল পুষ্করিণী, খাল ও রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন—সেগুলিকে নষ্ট হতে দেওয়া হয়েছে এবং জল নিকাশের ভালো ব্যবস্থা না থাকায় বারবার দুর্ভিক্ষ হচ্ছে।"

ভারতের জল নিষ্কাশনের আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তনকারী স্যর আর্থার কটন সাহেবের মন্তব্য মার্ক্স থেকেও কড়া। তিনি তাঁর বই-এ ("Public Works in India" 1854) লিখেছেনঃ "সারা ভারতে পূর্তকার্য একেবারেই অগ্রাহ্য করা হয়েছে—আজ পর্যন্ত সরকারী বুলি ছিলঃ কিছু কোরোনা, কিছু করা হোক বা অন্য কেউ কিছু করুক তাও করতে দিও না। যত ক্ষতি হয় হোক--লোকে দুর্ভিক্ষে মরুক, জল বা রাস্তার দরুণ লক্ষ লক্ষ টাকা রাজস্বে ঘাটতি পড়ে পড়ুক—কিন্তু প্রতিকারের কোনো উপায় কোরো না।" Lt. Col., Cotton. "Public Works in India" 1854, P272)

মণ্টগোমারী মার্টিন তাঁর "ভারত সাম্রাজ্য" নামক বইতে ১৮৫৮ সালে বলেছেন যে, পুরানো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী "সুধু যে কেবল উন্নতি করার কাজে অগ্রসর হয়নি তাই নয়—যে সকল কার্যের সংস্কার সাধনের উপর রাজস্ব নির্ভর করছে—সে সংস্কার সাধনও করেনি"। এই অবহেলা বিলাতের তদানীন্তন স্বাধীন বেচা-কেনার নীতিকেও ছাড়িয়ে

গেছে এবং সে-যে কতখানি তা ১৮৫৮ সালের ২৪শে জুন কমন্স সভায় জন ব্রাইট সাহেবের বক্তৃতা থেকে বোঝা যাবে। তিনি বলেছেনঃ "এক ম্যানচেষ্টার সহরে শুধু জল সরবরাহের জন্য যত টাকা ব্যয় হয়েছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩৪ থেকে ১৮৪৮ সালের এই চোদ্দ বছরের মধ্যে তার বিরাট সাম্রাজ্যের সমস্ত পূর্তকার্যেও তা ব্যয় করেনি।"

এমন কি, এই সেদিন ১৯০০ সালেও ইংরাজের বাণিজ্য প্রসারের খাতিরে সরকারী রাজস্ব থেকে রেল পথের জন্য ব্যয় করা হ'ল সাড়ে বাইশ কোটী পাউণ্ড; অথচ চাষের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাল বা জল নিকাশের নালার জন্য ব্যয় হ'ল মাত্র ঐ টাকার ৯ ভাগের একভাগ---অর্থাৎ আড়াই কোটী। অনেকে ভাবতে পারেন যে এসব অতীতের ব্যাপার, —বর্তমান কালে বুঝি ভালো ব্যবস্থাই হয়েছে। তাদের জন্য বেঙ্গল ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট কমিটির ১৯৩০ সালের রিপোর্ট উদ্ধৃত করছি ঃ

"প্রত্যেক জেলায় যেসব খালে নৌকা চলাফেরা করতে পারে—সেগুলি পলি প'ড়ে প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়। পূর্ব বঙ্গে খাল ও ছোট ছোট নদীগুলিই হচ্ছে তাদের রাস্তাঘাট, সুতরাং এগুলিতে নৌকা চলাচল ঠিক রাখা এই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পক্ষে কতখানি দরকারী তা বোধকরি বেশি ক'রে বলার প্রয়োজন নেই।"

"মধ্যবাংলা বর্তমানে ধ্বংসের পথে; সাঙ্ঘাতিক ভাবে

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত, জনসংখ্যা ক'মে যাচ্ছে এবং জমি-জমা পতিত হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এই ধ্বংস আগে থেকেই এমনি ভাবে শুরু হয়ে গেছে যে, এখন আর তাকে থামানো সম্ভব নয় এবং জমিজমাগুলি শেষ পর্যন্ত জলা ও জঙ্গলে পরিণত হতে বাধ্য।"

"ছোট ছোট রাস্তাগুলি টিঁকিয়ে রাখার বিষয়ে বস্তুত কিছুই করা হয়নি, ফলে এই প্রদেশের কোনো কোনো অংশে খালগুলি বুজে গেছে, বছরের কয়েকটা মাস কোনো নৌকা চলাচল করতে পারে না এবং বর্ষাকালে জল বাড়ার ফলে যখন নৌকা চলাচল শুরু হয় সুধু তখনি বেচাকেনার ফসল-সামগ্রী বাজারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।" (১১ পৃঃ)

বাংলার জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার দুর্গতি সম্পর্কে প্রসিদ্ধ হাইড্রোলিক ইঞ্জিনিয়ার স্যর উইলিয়ম উইলকক্স সাহেবের মন্তব্য দ্রষ্টব্য। স্যর উইলিয়ম মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় বিরাট বিরাট জল নিকাশের ব্যবস্থা প্রবর্তনকারী হিসাবে খ্যাতনামা। বর্তমানে তিনি বাংলা দেশের এই ব্যাপার অনুসন্ধান করেছেন এবং জানতে পেরেছেন যে, বাংলার ডেল্টাতে যেসব অসংখ্য ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী নদীগুলি এঁকে-বেঁকে চলেছে— এগুলি আগে খালই ছিল কিন্তু ইংরাজ-ব্যবস্থার ফলে এরা আজ বিপথে চালিত। আগে এইসব খালই গঙ্গার বানকে সুবিধামতো ছড়িয়ে দিত, স্বাভাবিক ভাবে জমি জল পেত—এবং বাংলা সেকালে তাই অত শস্য শ্যামলা ছিল ; যার লোভে অষ্টাদশ শতকের শুরুতে

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লুণ্ঠনকারী বণিকের দল এদেশের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়েছিল।—কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে জল নিকাশের এইসব উপায়কে উন্নত করা বা ব্যবহার করার কোনো ব্যবস্থা তো হয়ইনি—পরন্তু রেল পথের বাঁধ সৃষ্টি ক'রে এগুলিকে নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছিল। দেশের অনেকাংশ সারবহুল পলিবাহী গঙ্গার জলের সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে ক্রমে ক্রমে অনুর্বর হয়ে পড়েছে; এবং আরও অনেক জমিতে পুরোপুরি জল নিকাশ না হয়ে জল জ'মে ম্যালেরিয়ার অনিবার্য ডিপোতে পরিণত হয়েছে। গঙ্গার তীর যেখানে নিচু সেখানে কোনোরূপ বাঁধ না দেওয়ার ফলে বছরে বছরে কত গ্রাম—ফসল ও ক্ষেত-খামার সমেত—বন্যায় ধ্বংস হচ্ছে। স্যার উইলিয়ম বর্তমান শাসনকর্তা ও সরকারী কর্মচারীদের তীব্র ভাবে সমালোচনা ক'রে বলেছেন, "বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ নেবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এরা এই দুরবস্থার প্রতিকারের কোনো কিছুই করেনি —তাই বছরের পর বছর ব্যাপারটা সাংঘাতিক হয়ে চলেছে।" (G. Emerson, "Voiceless Millions", 1931, P. 240.—41) স্যার উইলিয়মের সম্পূর্ণ মতামত তাঁর ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রীডারসীপ বক্তৃতায় প্রদত্ত হয়েছে। Lectures of the Ancient System of Irrigation in Bengal and its Application to Modern Problems—এই বক্তৃতায় সরকার পক্ষ থেকে

বিতর্ক শুরু করেন, বঙ্গীয় ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্টের ভূতপূর্ব প্রধান ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সি-এডাম্‌স্‌-উইলিয়ম্‌স্‌ এবং তার আবার উত্তর দেন স্যার উইলিয়ম উইলকক্স। এই সমস্ত বিতর্ক এক সঙ্গে ক'রে ১৯৩১ সালে বঙ্গীয় সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপার্টমেণ্ট থেকে একটা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, এই ধ্বংসের কাহিনী ইংরাজ শাসনের গত শতাব্দী ও এই শতাব্দীর অর্ধেকের অতীত ইতিহাস নয়—বর্তমান কালেও এই অবস্থা চলেছে। ১৯৩০ সালে যখন জমির অত্যন্ত অভাব আছে ব'লে শোনা যায়, যখন চাষোপযোগী জমিগুলির উপর এত ভিড়, তখন সরকারী রিপোর্টে বলা হয় "জমি পতিত হয়ে যাচ্ছে!" ১৭৮৯ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ লিখেছিলেন যে কোম্পানীর অধিনস্থ ভূভাগের বিরাট অংশ "বন্য পশুর আবাস স্থান হিসাবে জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে"। আর ১৯৩০ সালে মধ্য-বাংলা সম্পর্কেও মত হ'ল এই যে, অধোগতি এতখানি অগ্রসর হয়েছে যে তাকে আর রোধ করা সম্ভব নয় এবং যে সকল জমি-জমা সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হচ্ছে তা শেষ পর্যন্ত জলা ও জঙ্গলে পরিণত হতে বাধ্য।"

এই সমস্ত তথ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে, চাষোপযোগী জমির মাত্র শতকরা ৫৩ ভাগে ফসল উৎপন্ন করতে পারা যায়—যার ফলে অন্যান্য দেশের তুলনায় জমির উপর নির্ভর ক'রে অনেকখানি আশা এদেশের চাষীদের করতে হয়। অথচ প্রভূত ঋণ, সামাজিক

দুরবস্থা, গুরুতর দারিদ্র্য ও সেকেলে চাষবাসের কায়দা—চাষীদের ঐ আশা পূরণের পক্ষে বিঘ্নকর। ফলে জমির উৎপন্ন ফসলের হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। ভারতের সঙ্গে চীন, জাপান বা আমেরিকার ধান ও গম চাষের একটা হিসাবে এটা বেশ বোঝা যাবে।

প্রতি একর জমিতে ১০০ পাউণ্ড হিসাবে ফসলের ফলন

	ভারত	চীন	জাপান	ইউ-এস্-এ
ধান	১৬˙৫	২৫˙৬	৩০˙৭	১৬˙৮
গম	৮˙১	৯˙৭	১৩˙৫	৯˙৯

("Problems of the Pacific"—1931, P. 70.)

লীগ অব নেশনের সংখ্যা দিয়ে আরো একটা তুলনামূলক দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

প্রতি একর জমিতে পাউণ্ড হিসাবে ফসলের ফলন

	ধান	গম
ভারত	১,৩৫৭	৬৫২
জাপান	২,৭৬৭	১,৫০৮
মিশর	২,৩৫৬	১,৬৮৮
আমেরিকা	২,১১২	৯৭৩
ইটালি	৪,৬০১	১,২৪১
জার্মাণী	...	১,৭৪০
বৃটীশ যুক্তরাষ্ট্র	...	১,৮১২

("Statistical Year-book of the League of Nations" —1932-33)

এই পার্থক্যটা আরো বড় হয়ে নজরে পড়বে যখন খেয়াল ক'রে দেখা যাবে যে এইসব দেশগুলিতে জমিপিছু কত লোক খাটছে। ভারতে ২-১/২ একর জমিতে একটী লোক খাটে—সেই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে ১৭-১৪ একর ও জার্মাণীতে ৫-১/২ একর জমিতে একটা লোক খাটে। ভারতে একটা লোক অল্প জমি নিয়ে খেটেও এত কম ফসল তৈরী করে! তাহ'লে মজুরীর কি সাঙ্ঘাতিক অপব্যয় হচ্ছে তা বেশ বুঝতে বোধকরি অসুবিধা হবে না। কিন্তু ফসল কম হচ্ছে ব'লে এই ধারণা করা ভুল যে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি কম। ভারতীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটীর রিপোর্টের ৭০০ পাতায় এ. পি. ম্যাক্‌ডুগালের মন্তব্যে এ বিষয়ে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ভারতের জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি মোটেই কম ছিল না—বরং সারা দেশব্যাপী বড় বড় নদী থাকাতে এক সময়ে জগতের সেরা উর্বর জমি ছিল এই নদীগুলির তীরবর্তী দেশসমূহ। কিন্তু সার না দিয়ে বার বার ফসল করাতে ও সারগুলি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করাতে (এখানে এই মন্তব্যে বনরক্ষা সম্পর্কিত কড়া আইনের উপর বক্রোক্তি করা হয়েছে) এই ব্যাপার ঘটেছে। এই মন্তব্যে আরো বলা হয়েছে যে পশ্চিমের (ইউরোপ প্রভৃতি) দেশগুলিতে ঘাস বা ফসলের অব্যবহার্য অংশগুলি জমির সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়—কিন্তু ভারতে সেগুলিকে গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে

ব্যয় করতে হয় (এখানে পশুচারণ ভূমি নাই ব'লে বক্রোক্তি করা হয়েছে)।

গোবরকে সার না ক'রে চাষীরা জ্বালানির জন্য ব্যবহার করে ব'লে অনেকে ভারতীয় চাষীদের এই কার্যকে বিশ্রী রকমের ক্ষতিকর অভ্যাস ব'লে কটুক্তি ক'রে থাকে—কিন্তু সরকারী কৃষি কমিশনের রিপোর্টে এই সম্পর্কে যে-কথা বলা হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য।—"বনের কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে নানা রকম বাধা-বিপত্তি থাকায় এবং কয়লা সংগ্রহ না করতে পারায় (কারণ রেল ভাড়ায় অনেক পয়সা লাগে তাই দাম বেশি পড়ে) গোবরই হ'ল একমাত্র জ্বালানি যা বিরাট কৃষক সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ লোকের কাছেই অতি সহজলভ্য।" (২৬৪ পৃষ্ঠা)।

এই অবস্থার প্রতিকার করার জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা নির্দেশ করা হয়নি—ফলে, জমি অনিবার্য ভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাংলার সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং এনক্যোয়ারী কমিটী ১৯৩০ সালের রিপোর্টে স্পষ্ট মন্তব্য ক'রে বলেছে: "সার না দিতে পারার দরুণ কৃষি-জমির উর্বরতা যেমন ক্রমান্বয়ে ক'মে যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের উৎপাদনও সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ক্রমান্বয়ে ক'মে আসছে।" (২১ পৃষ্ঠা) এই মন্তব্যের সমর্থনে তুলনা মূলক সংখ্যার যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হ'ল; এ থেকে বোঝা যায় অবস্থা কী গুরুতর সর্বনাশের দিকে দিনের পর দিন এগিয়ে চলেছে।

বাংলার প্রতি একর জমিতে গড়ে ফসলের ফলন (পাউণ্ড হিসাবে)

প্রতি পাঁচ বৎসর হিসাবে	গম	আমন ধান্য	ছোলা	সরিষা বা অনুরূপ ফসল
১৯০৬-৭	৮০১	১,২৩৪	৮৮১	৪৯২
১৯১১-১২	৮৬১	৯৮৩	৮৮১	৪৯২
১৯১৬-১৭	৬৯৮	১,০৩৬	৮৬৭	৪৬০
১৯২১-২২	৬৮৮	১,০২৯	৮২৬	৪৮৫
১৯২৬-২৭	৭২১	১,০২২	৮১১	৪৮৩
বিশ বছরে কমেছে	৮০	২১২	৭০	৯

এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, এদেশের বর্ধমান সামাজিক বিরোধগুলির কথা আপাততঃ ছেড়ে দিলেও সমগ্র অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সুধু কৃষি উৎপাদনের অবস্থা ও লক্ষণ-গুলি তুলনা করলেই মনে হয় যে আজ আমরা ভারতের কৃষি সমস্যার এক গুরুতর সঙ্কটকালে উপস্থিত হয়েছি। দেশের স্বাভাবিক অবস্থার স্কন্ধে এই সঙ্কট চাপালে উদ্বার নেই। সামাজিক সম্পর্কের জটিলতায় এই সঙ্কটের সমাধান খুঁজতে হবে। যে সব লোক স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ব'লে বেড়ায় যে কৃষকের বুদ্ধিহীনতা বা চাষবাসের সেকেলে ধরণই সুধু এই দুরবস্থার কারণ—তারা জানে না যে কৃষকের বক্ষশোষণ বন্ধ করতে না পারলে অথবা জমির স্বত্বঘটিত সম্পর্কে আমূল পরিবর্তন আনতে না পারলে কৃষিকার্যে একেলে ধরণের প্রথা প্রবর্তন করা সম্ভব হতে পারে না বা কৃষকও উন্নত হতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমানের

হাজারো রকমের বাধা-বিপত্তির মাঝেও ভারতের কৃষকরা তাদের কাজ-কর্মে যে বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে আসছে তাতে কৃষি বিশেষজ্ঞরা মুগ্ধ হয়ে গেছেন। ১৮৮৯ সালে সরকার ভারতের কৃষিপদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধান ক'রে উন্নতির উপায় নির্দেশ করবার জন্য রাজকীয় কৃষি সোসাইটীর কন্‌সালটিং কেমিষ্ট ডাঃ জে. এ. ভোয়েলকারকে নিযুক্ত করেছিলেন। দুই বছর পরে তাঁর যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় ভারতীয় কৃষি সম্পর্কে সেই রিপোর্ট আজও পর্যন্ত বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। তিনি লিখেছিলেন ঃ "ভারতের কৃষিব্যবস্থা সেকেলে এবং অনুন্নত,—এই রকম একটা ভুল ধারণা ইংলণ্ডে এবং অনেক সময়ে ভারতবর্ষেও পোষণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের চাষীসাধারণ ইংলণ্ডের চাষীর থেকে খারাপ তো নয়ই বরং অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত! যেটা খারাপ সেটা হ'ল যে উন্নতি করবার কোনো উপকরণই তাদের নেই—এবং এই ব্যাপারটা জগতের আর কোনো দেশে এত বিশ্রীভাবে দেখা যায় না। অথচ ভারতের চাষীরা ধৈর্য সহকারে, কোনো অভিযোগ পর্যন্ত না জানিয়ে যে-ভাবে এই বিপদে যুঝে যাচ্ছে—তা অতুলনীয়!

"আমার এই বক্তব্যে ইংরাজ চাষীর অবাক হওয়ার কিছুই নেই; কারণ তাদের মনে রাখা উচিত যে তাদের ইংলণ্ডে বসবাস করার অনেক শতাব্দী আগে থেকেই ভারতের চাষীরা গমের চাষ-আবাদ ক'রে আসছে। সুতরাং ভারতীয় কৃষকের উন্নতি করার পদ্ধতি আর নতুন-কিছু হতে পারে না। কিন্তু তারা

যে বেশি ফসল ফলাতে পারছে না তার কারণ হ'ল, উপযুক্ত সুযোগের অভাব,—জমিতে জল ও সার দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা ও উপাদানের অভাব।

"কিন্তু চাষবাস সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের দিক থেকে বিবেচনা করলে এদের নিন্দা তো করা যায়ই না বরং প্রশংসা করতে হয়। আগাছা থেকে জমিকে নিখুঁত ভাবে পরিষ্কার রাখা, জল দেওয়ার আশ্চর্য পদ্ধতি, জমি সম্পর্কে জ্ঞান এবং রোপন ও বপনের সময় সম্পর্কে সঠিক ধারণা— এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা সুধু-যে ভালো চাষীদেরই আছে তাই নয়—অতি সাধারণ চাষীবাসীরও আছে। কোনটার পর কোন ফসল করলে জমি ভালো থাকে—কোন কোন ফসল একসঙ্গে করা যায়—এবং কখন জমি ফেলে রাখলে ভালো হয়—এসব সম্পর্কে তাদের আশ্চর্য জ্ঞান। আমি যেখানে যেখানে গিয়েছি সেখানেই চাষ-বাস সম্পর্কে যে সতর্কতা, কঠিন পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও উদ্ভাবনী শক্তি চাষীদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি তার চেয়ে ভালো আর-কিছু হতে পারে না।" (Dr. S. A. Voelcker, " Report on the Improvement of Indian Agriculture", 1891).

তাহ'লে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে জমির স্বাভাবিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয় এবং চাষীদের ক্ষমতাও একেবারে কম নেই ; অতএব জমির স্বাভাবিক দুরবস্থা ও কৃষিকার্যে চাষীদের অক্ষমতা, এই দুই নজির কৃষি সঙ্কটের আসল কারণ হতে পারে না।

আসল কারণ হচ্ছে, বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও তার পৃষ্টপোষক সাম্রাজ্যবাদ। সাম্রাজ্যবাদ যে সমাজব্যবস্থাকে কায়েম ক'রে রেখেছে, যে সমাজব্যবস্থা কৃষকের ঘাড়ে নানা বোঝা চাপিয়েছে, কৃষিকার্যকে পঙ্গু ক'রে ফেলেছে—কৃষকের নিবিরোধ জীবন-যাত্রায় নানা দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করেছে, তাদের নিয়মিত ভাবে অনাহারে, অর্ধাহারে রেখে দিয়েছে—এবং এমনি ক'রে নিজের অজ্ঞাতসারে শেষ পর্যন্ত একটা বিরাট বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে অনিবার্য ভাবে একমাত্র চরম সমাধানের পথে নিয়ে চলেছে—কৃষিকার্যের সঙ্গে সেই সমাজব্যবস্থার সর্বৈব বিরোধ। কৃষিকার্য ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে এই অস্বাভাবিক সম্পর্ক সঠিক বিশ্লেষণ করতে পারলে তবেই কৃষি সঙ্কটের মূল কারণ নির্ণয় করা যাবে ও তার সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যাবে!—অন্যথায় নয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষকের দায়-ভার

জমির উপর বেশি লোকের ভিড়, ফসলের কম ফলন, এবং কোনো রকম উন্নতি করার সমস্ত পথ বন্ধ,—এই সব কারণে কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সঙ্কট দেখা গেছে, সেটা কেবল কৃষি সম্পর্কিত সমাজব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ গোলযোগের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যে-ধরণের নিষ্ঠুর ও ব্যাপক শোষণপ্রথা বেড়ে উঠেছে তার তুলনা অন্য কোনো দেশে মেলে না। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের রক্ষাকবচে রক্ষিত হয়ে এবং এরই উপর নির্ভর ক'রে কৃষকের ঘাড়ে একদল পরগাছা গজিয়েছে, যারা হচ্ছে বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়,—তারাও বর্তমান সমস্যা-সঙ্কুল ব্যবস্থায় একটা বিশিষ্ট অংশ হয়ে রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ কৃষকের ঘাড়ের বোঝা, দারিদ্র্য ও ঋণভার স্নুধু বাড়ছেই না—উপরন্তু সমাজ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, আর চাষীরা ক্রমান্বয়ে তাদের চাষের জমি ছেড়ে দিয়ে সর্বস্ব খোয়াতে বাধ্য হচ্ছে। জমিহীন চাষীরা যে-অবস্থায় চ'লে যাচ্ছে তাকে প্রায় সেকালের দাসত্ব

প্রথার অনুরূপ বলা চলে। তাদের অনেকে ভূমিহীন সর্বহারার ক্রমবর্ধমান দল পুষ্ট করছে। আর এই ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই অদূর ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক ঝঞ্ঝার কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠছে।

জমির একচেটিয়া স্বত্ব

ইংরাজ শাসনের পূর্বে ভারতের চিরকেলে প্রথা অনুযায়ী কৃষকরাই ছিল জমির মালিক এবং সরকার কেবল ফসলের অংশ গ্রহণ করত। অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জী বলছেন: "ভারতের ভূমির স্বত্বাধিকার জাতির অথবা তার বিভিন্ন অংশ যেমন— গ্রাম্য সমাজ, গোষ্ঠি বা গ্রাম সংলগ্ন ভ্রাতৃ সমবায়ের অধীনেই ছিল; ...জমি কখনও রাজার সম্পত্তি ব'লে পরিগণিত হতে পারত না। সামন্ততন্ত্রেই হোক আর রাজতন্ত্রেই হোক, কৃষক ছাড়া জমির মালিকানা-স্বত্ব যে আর-কারো হতে পারে এ ধারণাই কখনও হয় নি।" (Land Problems of India—1933—P. 16 and 36)

হিন্দুরাজাদের আমলে চিরকেলে প্রথাই ছিল এই যে ফসলের ১/১২ থেকে ১/৬ অংশ রাজা পাবে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ১/৪ অংশও নিতে পারে। মনুর বচনে আছে: "জোঁক, গরুর বাছুর এবং মৌমাছিরা যেমন খাদ্য সংগ্রহ করে তেমনি রাজাও তার রাজত্ব থেকে অল্প-স্বল্প কর আদায় করবে। সোনা ও গবাদি পশুর ক্ষেত্রে রাজা এক-পঞ্চমাংশ পাবে এবং ফসলের ব্যাপারে ১/৮, ১/৬ অথবা ১/১২ অংশ নিতে

পারে। তবে যদি কোনো ক্ষত্রিয় রাজা যথাসাধ্য প্রজা রক্ষার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয় তাহ'লে ফসলের ১/৪ অংশ পর্যন্ত পেতে পারে।"

মোগল সাম্রাজ্য পত্তন হ'লে এই আদায় ১/৩ অংশ ধার্য করা হয়েছিল। আকবরের কানুনে লেখা আছে ঃ "পূর্বে হিন্দুস্থানের রাজারা রাজস্ব হিসাবে ফসলের ১/৬ অংশ আদায় করত। মাঝামাঝি রকমের চাষের জমির ফসলের উপর মহামান্য সম্রাট ১/৩ অংশ আদায় করা স্থির করলেন।"

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সমসাময়িক কালে রাজস্ব আদায়কারীরা নিজেরাই প্রায় সামন্ত প্রভুতে উন্নীত হয়েছিল— এরা এবং স্ব-স্বপ্রধান সামন্ত প্রভুরা ফসলের প্রায় অর্ধেক পর্যন্তও আদায় ক'রে নিত। মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যখন ইংরাজ শাসন কায়েম হ'ল—তখন ইংরাজেরা চিরাচরিত প্রথানুসারেই জমির ফসল হিসাবে রাজস্ব আদায় শুরু করে,—কিন্তু ইংরাজ অবিলম্বে এই পদ্ধতির রূপ পালটিয়ে দেয় এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে ভূ-স্বত্ব সম্পর্কিত ব্যবস্থাও বদলিয়ে যায়।

ইংরাজের হাতে শাসনভার চ'লে যাওয়ার আগে পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থা দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল; কৃষকের কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি ক'রে অনেক বেশি হারে আদায় করা হোত। তথাপি গ্রাম্য সমাজব্যবস্থা বা তার সঙ্গে জমির যে চিরাচরিত স্বত্ব-সম্পর্ক—তা নষ্ট হয় নি এবং সারা বৎসরে উৎপন্ন মোট ফসলের একটা অংশ হিসাবেই রাজস্ব দেওয়া

হোত (সাধারণত ফসলই দেওয়া হোত—ইচ্ছানুযায়ী ফসলের পরিবর্তে টাকাও দেওয়া যেত)। এখন যেমন, ফসল হোক বা না হোক, প্রতি খণ্ড জমির উপর যে-কর নির্দিষ্ট হিসাবে ধার্য করা আছে সেই হিসাবে খাজনা দিতে হবেই হবে—এমন নিয়ম তখনও হয় নি।

বিজয়ী ইংরাজ শাসকরা কিন্তু সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার জবর-দস্তিমূলক রাজস্ব-হারকে স্বাভাবিক ব'লে ধ'রে নিয়ে নিজেদের কর-নির্ধারণের নীতি শুরু করলে। তৎকালীন অনেক লেখকদের লেখায় জানা যায় যে প্রথম দিকে নতুন শাসকরা বেশি হারেই কর ধার্য করেছে। আবার কোনো কোনো লেখক বলেছেন যে আদায়ের সুবন্দোবস্ত হওয়ার দরুণ কার্যত আদায়টাই বেশি হয়েছে। কোম্পানীর পক্ষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ডাঃ বুকানন পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ক'রে জানান যে নতুন ধরণের আদায় কৃষকদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বহ ও চরম হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ ভারতে ১৮০০ সালে এবং উত্তর ভারতে ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত এই অনুসন্ধানকার্য হয়েছিল। বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলা সম্পর্কে ডাঃ বুকানন লিখেছেন ঃ "ভারতীয়েরা অভিযোগ ক'রে বলে, যদিও মোগল কর্মচারীরা তাদেরকে নিংড়িয়ে আদায় করত এবং অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত —তবু এখন (ইংরাজের আমলে) খাজনা দিতে না পারলে যে জমি বিক্রী ক'রে দেওয়া হয়—এই অসহ্য নীতির থেকে সে যন্ত্রণা অনেক ভালো ছিল। এ ছাড়া ইংরাজ শাসনে ঘুষ

নেওয়ার প্রথা প্রায় সব ক্ষেত্রেই শুরু হয়েছিল এবং ভারতীয়রা তাই অভিযোগ করে যে ঘুষ সমেত এখন তাদের যত পরিমাণ দিতে হয় তখন (মোগল আমলে) তার অর্ধেকও দিতে হোত না।" (Dr. Francis Buchanan, "Statistical Survey," Vol. vi, vii, quoted in the Fifth Report of the Select Committee of the House of Commons, 1872.)

১৮২৬ সালে বিশপ হেবার লিখেছেন :

"এখন যে হারে কর ধার্য করা হয়েছে তাতে, আমার মনে হয়, দেশী বা ইউরোপীয় কোনো কৃষকই উন্নতি করতে পারে না। জমির মোট ফসলের অর্ধেকই সরকারী পাওনা। ... উত্তর ভারতে রাজকর্মচারীদের মধ্যে একটা সাধারণ মনোভাব লক্ষ্য করলাম এবং তাদের সঙ্গে আমারও অভিমত এই হ'ল যে, কোম্পানী-শাসনের অধীনস্থ প্রদেশগুলির চাষীদের অবস্থা দেশীয় নরপতিদের শাসিত প্রজাদের থেকে অনেক খারাপ। আর, এই মাদ্রাজের মতো দেশে—যেখানে জমি তত উর্বর নয়—সেখানকার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমরা লোকের কাছ থেকে যতটা কর আদায় করি কোনো দেশীয় নরপতি তা করে না।" —(Bishop Heber, "Memoirs and Correspondence." 1830, Vol. II, P. 413 .)

ইতিহাসজ্ঞ টম্‌সন্ ও গ্যারেট্ সাহেব জানাচ্ছেন : "সিপাই বিদ্রোহের আগে মোট ফসলের পরিমাণ অনুপাতে ধার্য হয়েছে

ব'লে যে 'মুদ্রা-কর' নেওয়ার বারবার চেষ্টা হয়েছিল—তা ব্যর্থতার ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। গোড়াতে বাংলার রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থায় যে নিলাম-বিলির পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছিল—তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'মোট ফসলের' যতটা সম্ভব আদায় ক'রে নেওয়া। এই কৌশল বিফল হওয়ায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন করা হয়। মাদ্রাজে ও বোম্বাই-এ নির্ধারিত 'মোট ফসলের' ৪/৫ অংশ কর হিসাবে আগে ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল, ব্যাপারটা অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কর নির্ধারণের প্রথম চেষ্টাই এমনি ক'রে ব্যর্থ হয়ে যায় এবং ১৮০২ সালে এ চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ যে-দুর্দশা হয়েছিল—তার অনেকখানি কারণ হ'ল—অতিরিক্ত কর আদায়। পাঞ্জাবে ইংরাজেরা শিখদের থেকেও খাজনা কমিয়ে দিয়েছিল সত্যি—কিন্তু সেখানেও মুদ্রানীতিতে কর আদায় এবং আদায়ের কড়াকড়ি ব্যবস্থা ক'রে চাষীদিগকে ঐ সুবিধাটুকু ভোগ করতে দেওয়া হয় নি।" (H. Calvert, "Wealth and Welfare of the Punjab, P-122,)— (Thompson and Garratt, "Rise and Fulfilment of British Rule in India," P. 427)

১৯২১ সালে ডাঃ হ্যারল্ডম্যান্ দাক্ষিণাত্যের একটি গ্রামে দ্বিতীয় অনুসন্ধানের সময় ইংরাজ-শাসনের আগের এবং পরের রাজস্ব আদায় ব্যাপারের মধ্যে আশ্চর্য রকমের পার্থক্য দেখতে

পান। —"ইংরাজের জয়ের পর এক আমূল পরিবর্তন হ'ল। গ্রামটীতে ১৮২৩ সালে ২,১২১৲ টাকা রাজস্ব আদায় হ'ল এবং ১৮১৭ সালে ঐ গ্রামের যে সকল খরচপত্র হয়েছিল—১৮২৩ সালে সেসব অর্দ্ধেক হয়ে গেল—এটা একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার।" (Mann and Kautikar, "Land and Labour in a Deccan Village," Vol. II, 1921, P. 38) ১৮৪৪ সাল থেকে ১৮৭৪,—এই ত্রিশটী বছরে ঐ গ্রামের সমগ্র জমির খাজনা নির্ধারিত ছিল ১,১৬১৲ টাকা, বা প্রতি একরে ॥/৪ পাই। পরের ত্রিশ বছরে—অর্থাৎ ১৮৭৪ থেকে ১৯০৪ সালের মধ্যে মোট খাজনা হ'ল ১,৪৬৭৲ টাকা, বা প্রতি একরে ॥৵৪ পাই। ১৯১৫ সালে নতুনভাবে ধার্য হয়ে উক্ত মোট খাজনার পরিমাণ দাঁড়াল ১,৫৮১৲ টাকা, বা প্রতি একরে ৸২ পাই। ডাঃ ম্যান্ ১৯১৭ সালে তাঁর প্রথম অনুসন্ধানের ফলে দেখেছিলেন যে ১৮২৯-৩০ সালের মোট রাজস্ব (একটী গ্রামের) ৮৮৯৲ টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে ১৮৪৯-৫০ সালে ১,১১৫৲ টাকায়, এবং ১৯১৪-১৫ সালে ১,৬৬০৲ টাকায় পরিণত হয়েছিল।

বাংলাদেশে মোগল অনুচরদের শাসনের শেষ বছরে, ১৭৬৪-৬৫ সালে, রাজস্ব হয়েছিল ৮১৮,০০০ পাউণ্ড; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রথম বছরেই এটা বেড়ে গিয়ে ১৪,৭০,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়াল। ১৭৯৩ সালে—যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পত্তন হয়—তখনকার আদায় আরও বেড়ে গিয়ে হ'ল ৩০,৯১,০০০ পাউণ্ড।

১৮০০-১ সালে কোম্পানীর সমগ্র রাজস্ব ছিল ৪২ লক্ষ পাউণ্ড। ১৮৫৭-৫৮ সালে—যখন ভারতবর্ষ কোম্পানীর শাসন থেকে সম্রাটের শাসনে চ'লে যায়—তখন ঐ রাজস্ব বেড়ে ১ কোটী ৫৩ লক্ষ পাউণ্ড হয়। এই বাড়তি আদায় দুই রকমে হয়েছিল :— নতুন যায়গা দখল ক'রে এবং কর-হার বাড়িয়ে। সম্রাটের অধীনে এই রাজস্ব ১৯০০-১ সালে ১ কোটী ৭৫ লক্ষ এবং ১৯১১-১২ সালে ২ কোটী পাউণ্ডে দাঁড়ায়; এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে দেখা যাচ্ছে ২ কোটী ৩৯ লক্ষ পাউণ্ড হয়েছে।

আধুনিক কালে রাজস্ব নির্ধারণের সময় মোট ফসলের অর্ধেকের বেশি কর হিসাবে ধার্য করা সম্ভব হয়নি—কারণ ইংরাজ শাসনের প্রথম দিকে যে-রকম জবরদস্তি ক'রে বেশি আদায় চালানো হয়েছিল—সেই জবরদস্তি দীর্ঘকাল কায়েম রাখা বিপজ্জনক হয়ে প'ড়েছিল। কিন্তু আজকাল জমিদারী প্রথার দৌলতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য জিনিষের উপর নানারকম কর ধার্য ক'রে বিচিত্র ধরণের কর আদায় করা হচ্ছে, ফলে এই সব আদায়ের মোট পরিমাণ জমির রাজস্ব থেকে অনেক বেশি হয়ে পড়ছে।

তথাপি আজকাল যখনই কোনো যায়গায় নতুনভাবে জমির উপর খাজনা ধার্য করার সুযোগ এসেছে—তখনই তা বর্ধিত হারে করা হয়েছে এবং তার ফলে বিদ্রোহও হতে দেখা গেছে। ১৯২৮ সালে বারদোলীর ৮৭,০০০ হাজার

কৃষক কংগ্রেসের নেতৃত্বে মিলিত হয়ে খাজনাবৃদ্ধি ঠেকিয়েছিল এবং সরকারকে স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল যে নতুন ক'রে খাজনা বৃদ্ধি করা সুধু অন্যায় নয়, পরন্তু খাজনার হার কমিয়ে দেওয়াই ন্যায়সঙ্গত হবে। এই বারদৌলী সত্যাগ্রহ সম্পর্কে সরকার পক্ষীয় একটী মন্তব্য উদ্ধৃত করছি, —তার থেকে বোঝা যাবে যে সরকারপক্ষ এই ব্যাপারে কিরূপ রাগান্বিত হয়েছিল। অবশ্য, কৃষকদের দাবীর যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা হয়নি—কিন্তু এই মন্তব্যে অভিযোগ করা হয়েছে যে সমস্ত রকম রাজস্ব নির্ধারণের পক্ষে এটা নাকি খারাপ নজির হয়ে থাকল। "বারদৌলীর খাজনা-ধার্য ব্যাপারটা সাধারণ ভাবেই ঝালিয়ে দেখা হচ্ছিল; কিন্তু নতুন রাজস্ব-দাবীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতারা আপত্তি জানালেন; তার জন্য একটা সরকারী অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেল যে সত্যিই খাজনার হার অত্যন্ত বেশি। এই ক্ষেত্রে খাজনাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনের সার্থকতা ছিল—কিন্তু এই ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য হ'ল এই যে এটা একটা নজির হয়ে দাঁড়াল। ভবিষ্যতে নতুনভাবে কোথাও খাজনা নির্ধারণের ব্যাপার একটা রাজনৈতিক গোলমালের বিষয় হয়ে পড়বে।" (W. H. Moreland, C. S. I., C. I E. "Peasant, Landholders and the state in Modern India", 1932, P. 166)

রাধাকমল মুখার্জী তাঁর "Land Problems of India" বই-এ বলেছেন যে বিশেষ ক'রে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে

লাফে লাফে জমির খাজনা বেড়ে গেছে (২০৬ পৃঃ)। তিনি আরো বলেছেন যে ১৮৯০-৯১ সাল থেকে ১৯১৮-১৯ সালের মধ্যে জমির উপর রাজস্বের পরিমাণ ২৪ কোটী টাকা থেকে ৩৩ কোটী টাকায় পরিণত হয়েছে ; এবং যুক্তপ্রদেশ মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের কৃষি-আয় এই ত্রিশ বছরে যথাক্রমে যখন শতকরা ৩০, ৬০ ও ২৩ হারে বেড়েছে, তখন জমির উপর খাজনাবৃদ্ধির হার হয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৫৭, ২২-১/২ ও ১৫-১/২। শুধু তো বৃদ্ধি নয়— এই খাজনা আবার ফসলের পরিবর্তে টাকায় শোধ দিতে হবে এবং আদায়ের কিস্তি হ'ল ফসল উঠতির সময়ে। ঐ সকল প্রদেশের অধিকাংশ চাষীর জমিতেই ভালো ফসল হয় না—সুতরাং খাজনাবৃদ্ধির এই হার তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে রীতিমতো ঘায়েল করেছে।—(৩৪৫ পৃঃ)

ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন

ইংরাজ শাসন ভারতবর্ষে জমির খাজনা বৃদ্ধি ক'রে চাষীর ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে যতটা করতে পেরেছে তার চেয়ে অনেক গুরুতর পরিবর্তন সাধন করেছে ভূমিব্যবস্থা ওলট-পালট ক'রে। বিলাতী কায়দায় খাজনা ধার্য ও স্বত্ব নির্দেশ করাটা অবশ্য এই ওলট-পালটের প্রথম ধাপ। ভারতের চিরাচরিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর বিলাতী অর্থনীতি ও আইনের বিধিব্যবস্থা জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল।

এদেশে খাজনা দেওয়ার পদ্ধতি পূর্বে এ ধরণের ছিল না ; সারা বছরের ফসল হিসাব ক'রে—যেবারে যেরকম ফসল হ'ল বা না হ'ল, সেই সব বিচার ক'রে যৌথ কৃষক-মালিকরা বা স্বায়ত্ব-শাসিত গ্রাম্য পঞ্চায়েতরা সমষ্টিগত ভাবে শাসনকর্তার পাওনা (রাজার অংশ) বা ট্যাক্স মিটিয়ে দিত। এই প্রথার যায়গায় জোর ক'রে ইংলণ্ডের প্রথা ভারতের ঘাড়ে চাপানো হ'ল। প্রত্যেকটী লোককে—তা-সে খাঁটি কৃষকই হোক বা সরকার নিযুক্ত জমিদারই হোক—তার জমির পরিমাণ অনুপাতে ফসলের পরিবর্তে মুদ্রাতে বাৎসরিক কর নির্ধারণ ক'রে দেওয়া হ'ল। এখন, জমিতে ফসল ভালো হোক আর মন্দ হোক বা মোটে নাই হোক—জমি একেবারে চাষ করাও যদি না হয় তাহ'লেও—খাজনার টাকা বৎসরে বৎসরে দিয়ে যেতেই হবে ! সেকালের শাসনকর্তারা সরকারী নথি-পত্রে এই আদায়কে জমির 'খাজনা' (Rent) ব'লে উল্লেখ করতেন ; অতএব এ-থেকে বেশ বোঝা যায় যে তখন পর্যন্ত স্বত্ব সম্পর্কিত চিরাচরিত অধিকার কৃষকের হাতে কিছু কিছু বজায় থাকলেও কৃষকেরা তখন থেকেই শাসকদের কাছে প্রজা ব'লে গণ্য হতে আরম্ভ করেছিল,—তা-সে সরাসরি রাজার অধীনস্থ প্রজাই হোক, অথবা রাজার নিযুক্ত জমিদারের অধীনস্থ প্রজাই হোক। ভারতের ঘাড়ে বিলাতী কায়দায় জমিদারী প্রথা এইভাবে চাপানো হ'ল। ভারতের ইতিহাসে এর জুড়ি মেলে না। ট্যাক্স আদায়কারীদের করা হ'ল এক নতুন শ্রেণী—জমিদার

শ্রেণী। বিদেশী ইংরেজ বুর্জোয়াদের সব আইন-কানুন ভারতের অর্থনীতির কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হ'ল। জমির উপর ব্যক্তিগত স্বত্ব সৃষ্টি করা হ'ল ; জমি বন্দক দেওয়া শুরু হ'ল, জমি বেচা-কেনা চলল। বিদেশী আমলাতন্ত্র তার আইন, বিচার ও শাসনের সব ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে এই বিদেশী কানুন অতি সহজেই চালু ক'রে দিল।

এই পরিবর্তনের ফল হ'ল এই যে জমির আসল মালিক হ'ল সরকার এবং কৃষকরা প্রজায় পরিণত হ'ল! এখন থেকে—খাজনা অনাদায়ে কৃষককে জমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, সরকারের পছন্দমতো লোককে জমিদার ক'রে বসানো এবং খাজনা দিতে না পারলে তাদেরও জমিদারী থেকে উৎখাত করা—ইত্যাদি ক্ষমতা সরকারের অধিকারে দাঁড়াল। সেকালের স্বায়ত্ত-শাসনযুক্ত গ্রাম্য সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও শাসন-ক্ষমতা অপহরণ ক'রে নেওয়া হ'ল—সর্বসাধারণের অধিকাংশ জমিই ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত ক'রে দেওয়া হ'ল। জমির স্বত্ব সম্পর্কে ইংরাজদের বুর্জোয়া ধারণাই হচ্ছে, 'জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি' হবেই,—সমষ্টিগত সাধারণ সম্পত্তি হবে না। এই ভাবে সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ বিস্তারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ভারতবর্ষে অতি নিষ্ঠুর ভাবেই সমাপ্ত হ'ল, এবং কৃষকও জমি থেকে বিতাড়িত হ'ল। এই সব ক্রিয়াকলাপ নানারকম আইনের কারচুপিতে ঢেকে রাখা হয়েছিল। ফলে,—আজ দেড়শো বছর পরে জমির স্বত্ব, অধিকার এবং খাজনা

সম্পর্কিত ব্যাপারে এক দুর্ভেদ্য জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। জমির মালিকানা থেকে কৃষক আজ প্রজায় পরিণত হয়েছে কিন্তু জমি বন্দকের দায় ও জমির দরুণ ঋণের বোঝা কৃষকদেরই পোহাতে হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে এই বোঝা আজ এত বেড়ে উঠেছে যে গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে কৃষিজীবি জনসাধারণের ১/৩ থেকে ১/২ অংশ লোক ভূমিহীন মজুরশ্রেণীভূক্ত হচ্ছে, অথবা কৃষি-সর্বহারা রূপ নতুন শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে।

এই পরিবর্তনের প্রথমদিকটা লক্ষ্য ক'রে কার্ল মার্ক্স মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতের সেকেলে গ্রাম্য সমাজ ইংরাজরা ভেঙে দিয়েছিল। বুর্জোয়া-বাণিজ্যের সম্প্রসারণদ্বারা বা কলে-তৈরী-জিনিষপত্র চালিয়ে সুধু পরোক্ষভাবেই এই ভাঙাচোরার কাজ নিষ্পন্ন হয় নি, "শাসক ও জমিদার হিসাবে বিজয়ী ইংরাজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে প্রত্যক্ষভাবেও তা করেছিল।" চীনদেশের সঙ্গে তুলনা ক'রে মার্ক্স বলেছিলেন যে চীনদেশে এ কার্য আস্তে আস্তে হচ্ছে, কারণ ওখানে "ইংরাজের রাজনৈতিক শক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই।" মার্ক্সের বক্তব্যটা প্রণিধানযোগ্য: "ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার পূর্বেকার জাতিভিত্তিক উৎপাদন-ব্যবস্থা, তার আভ্যন্তরীণ সংহতি ও সুযোগ-সুবিধার জোরে যে কী ভাবে ধনতান্ত্রিক বাণিজ্যের মারাত্মক শক্তিকেও বাধা দিতে পারে, তার উদাহরণ ইংরাজের সঙ্গে ভারত ও চীনদেশের সম্পর্ক দেখলে বোঝা যাবে। ভারত ও চীনদেশের উৎপাদন-পদ্ধতির প্রধান শিকড় হচ্ছে

ছোট ছোট গ্রামের কৃষি-উৎপাদন ও কুটির-শিল্পের একতার উপর। ভারতে ইংরাজেরা একাধারে শাসক ও জমিদার হিসাবে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল—এই সকল ছোট ছোট অর্থনৈতিক সংগঠনগুলিকে নষ্ট করার উদ্দেশ্যে। যদি কোনো জাতির ইতিহাসে পরীক্ষামূলক অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থায় পরপর অসাফল্য এসে থাকে এবং বাস্তবক্ষেত্রে নিতান্ত অসম্ভব কোনো ব্যবস্থার কলঙ্কময় দৃষ্টান্ত থেকে থাকে—তবে সে একমাত্র ইংরাজ কর্তৃক ভারত শাসনের ইতিহাসেই আছে। বাংলাতে তারা বিলাতী জমিদারী প্রথাকে বিকৃত ক'রে এক কিম্ভূতকিমাকার ব্যবস্থার সৃষ্টি করে। দাক্ষিণাত্যের জমি ছোট ছোট ভাগে বিলিয়ে দেবার পদ্ধতির মধ্যেও এক উদ্ভট বিকৃত প্রথার প্রবর্তন করে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে ভারতীয় সমবায় সমাজের জমির উপর সাধারণের স্বত্ব-স্বামিত্বেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রাণপণ চেষ্টায় আর এক দফা তামাসার সৃষ্টি করে।" (Marx, "Capital" Vol. III, X X. pp. 392-3)

জমিদারী প্রথা সৃষ্টি

বিজয়ী ইংরাজ প্রথমে ইংলণ্ডের জমিদারী প্রথাকে সামান্য একটু অদল-বদল ক'রে এদেশে চালু করবার চেষ্টা করে। লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—যা ১৭৯৩ সালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশ ও শেষে উত্তর-মাদ্রাজের কিছু অংশে প্রচলন করা হয়েছিল—তার প্রকৃত রূপই এই। যারা কমিশনের

ভিত্তিতে সরকারের জন্য ট্যাক্স আদায় করত বা যাদের সরকার ঐ কার্যের জন্য নিযুক্ত করেছিল—তাদেরকেই তখন জমিদার ক'রে দেওয়া হ'ল। এরা সরকারী ভাবে আদায়ের শতকরা আড়াই ভাগ কমিশন পেত,—যদিও কার্যত বে-আইনী ভাবে অনেক বেশি আদায় ক'রে নিত! নতুন ব্যবস্থায় এদের দেয় টাকার একটা চিরস্থায়ী পরিমাণ ঠিক হয়ে গেল—চাষীরা পূর্বে যে টাকা জমিদারকে দিত, তার ১০ ১১ ভাগ সরকারকে দিতে হবে—এবং বাকী ১/১১ ভাগ জমিদারদের থাকবে—এই ভাবে প্রথমটা সাব্যস্ত হ'ল।

প্রথম অবস্থায় এই হার প্রজা এবং জমিদার উভয়েরই পক্ষে বড় কষ্টকর হয়েছিল, এবং সরকারের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক হয়েছিল। —আগেকার শাসকদের আদায়ের তুলনায় বাংলার জমিদারদের দেয় ৩০ লাখ পাউণ্ড ঢের বেশিই হ'ল বলতে হবে। সেকেলে অনেক বনিয়াদী জমিদারবংশ, যারা প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার দিনে দয়াপরবশ হয়ে আদায়ের উপর বেশি জোর দিত না, তারা এই নতুন নিয়মে উচ্ছেদ হ'তে লাগল,—তাদের জমিদারী নির্দয়ভাবে নিলামে বিক্রী ক'রে দেওয়া হতে লাগল! এই সকল উন্নতমনা জমিদারবংশ-ধ্বংসের করুণ কাহিনী সেকালের ইতিহাসে অনেক পাওয়া যায়। এদের পরিবর্তে নতুন ধরণের একদল নির্মমচিত্ত রক্তশোষক লোক এসে এই সব জমিদারী নিতে লাগল;—এরা সরকারের খাজনার জন্য এবং নিজেদের পকেট ভরাবার জন্য কোনো নিষ্ঠুর কাজই করতে

পিছপাও হত না ! চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নাকি উদ্দেশ্যই ছিল, এই ধরণের তথাকথিত "ভদ্রলোক ভূম্যধিকারীর" সৃষ্টি করা। ১৮০২ সালে মেদিনীপুর জেলার কালেক্টার এই ব্যাপার সম্পর্কে লিখেছেন :

"জমিদারী দখল ক'রে নিয়ে বিক্রী ক'রে দেওয়ার প্রথা কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলার বড় বড় জমিদারদের পথের ভিখারীতে পরিণত করেছে। কোনো দেশে কোনোকালে এত অল্প সময়ের মধ্যে শুধু আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার প্রভাবে এমন কাণ্ড ঘটে নি।"

পরবর্তীকালে অবশ্য, এই প্রথার দরুণ ঠিক উল্টো ফল ফলেছে; এবং আশ্চর্যের বিষয় সরকার সে ব্যাপার আগে থেকে কল্পনাও করতে পারে নি। টাকার মূল্য ক'মে যাওয়ায় এবং চাষীদের উপর বে-আইনী আদায়ের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায়—লুণ্ঠনের কারবারে সরকারের ভাগ ক'মে যেতে লাগল এবং জমিদারের অংশ বাড়তে লাগল। সরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের খাতিরে ৩০ লাখ পাউণ্ডের বেশি তো আর আদায় করতে পারে না ! আজ বাংলায় মোট খাজনা আদায় হয় ১ কোটি ২০ লাখ পাউণ্ড এবং মাত্র ৩০ লাখ যায় সরকারের পকেটে, আর ৯০ লাখ জমিদারের। বস্তুত, বে-আইনী আদায় মোট খাজনার অনেক উপরে উঠে গেছে। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইন সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রজাস্বত্ব আইন আলোচনা কালে তিনজন সদস্য মোট আদায় সম্পর্কে তিনটী সংখ্যা উদ্ধৃত করেছিলেন। একজন

বলেছিলেন,—মোট আদায় ২৯ কোটী টাকার মধ্যে ১৭ কোটী আইন মাফিক এবং ১২ কোটী বে-আইনী আদায়। '—আর একজন বলেছিলেন, ৩০ কোটী টাকা মোট আদায়ের ২০ কোটী আইন মাফিক এবং ১০ কোটী বে-আইনী। —অন্য একজন বলেছিলেন, মোট ২৬ কোটীর ২০ কোটী আইন মাফিক এবং ৬ কোটী টাকা বে-আইনী আদায়।

এই ব্যাপারটা যখন বোঝা গেল তখন এক জমিদার ছাড়া সকলেই, কৃষক ও ভারতের অন্যান্য শ্রেণীর লোক—এমন কি সাম্রাজ্যবাদীরাও জমিদারী প্রথার নিন্দা করতে লাগল। আজ এই প্রথা বদলাবার জন্য একটা শক্তিশালী আন্দোলন চলছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথাকে সাম্রাজ্য-বাদীরাও যে কতখানি নিন্দা করতে পারে, তা'র প্রমাণ অক্সফোর্ড হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়ার ৫৬১-৭০ পাতায় মিলবে। সাম্রাজ্যবাদের আধুনিক মোসাহেবরা বলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যাপারটায় সরকারের কোনো দোষ ছিল না—জমিদাররা যে জমির প্রভু নয়—এই কথাটা না-জানার দরুণ নাকি এই ভুল হয়ে গেছে। তাই অ্যান্‌ষ্টে তাঁর Economic Development of India-র ৯০ পৃষ্ঠায় বলেছেন : "প্রথমদিকে জটিল ভারতীয় প্রথা কোম্পানীর কর্মচারীদের পক্ষে বোধগম্য হয়নি। তারা 'জমির প্রভু' অনুসন্ধান করতে লাগল। ......পরে দেখা যায় যে এই সব জমিদাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো কালেই জমির মালিক ছিল না।...কিন্তু সেই সময়

তাদেরকেই—ইংরাজীতে যাকে বলে 'জমির প্রভু', তাই ধ'রে নেওয়া হয়েছিল।"

এগুলো হচ্ছে ছেলে-ভুলানো গল্প। সেকালের সরকারী দলিল-পত্র ঘাঁটলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, যারা এই কার্য করেছিলেন—তারা বেশ জানতেন যে তারা একটা নতুন শ্রেণী তৈরী করছিলেন এবং কী উদ্দেশ্যে তা করছিলেন তাও তাদের ধারণায় ছিল।

ইংরাজ শাসনের সামাজিক ভিত্তি হিসাবে নতুন একটা শ্রেণী তৈরী করার জন্য ইংরাজী কায়দায় চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথার সৃষ্টি করা হয়। একটা বড় দেশ অল্পসংখ্যক ইংরাজ শাসন করতে পারে না—তাই ভারতীয় সমাজে এমন একদল লোক তৈরী করার দরকার হয়েছিল, যারা তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থায় কিছু লাভের অংশ পাওয়ার জন্য ঐ শাসনকে কায়েম রাখবে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাঁর এই নীতিকে সমর্থন করার জন্য যে বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে তিনি পরিষ্কার ভাবে জানিয়েছেন, তিনি যে একটা নতুন শ্রেণী তৈরী ক'রে তাদের নতুন অধিকার দিচ্ছেন—(যা পূর্বেকার জমিদারদের ছিল না) এটা তিনি ভালো মতেই অবগত আছেন।—স্যর রিচার্ড টেম্পল তাঁর "Men and Events of my time in India" পুস্তকের ৩০ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা বাংলা দেশে ইংলণ্ডের ভূমিব্যবস্থাকে চালু ক'রে দেওয়া হ'ল। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক, ১৮২৮

থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতের বড়লাট হিসাবে এক সরকারী বক্তৃতায় খুব পরিষ্কার ক'রে বলেছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা ঃ

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ত্রুটী আছে সত্য ; তবু এর দ্বারা জনগণের উপর পূর্ণ কর্তৃত্বশালী বড় একদল ধনী ভূম্যধিকারী সম্প্রদায় তৈরী হয়েছে ; এতে এই বিরাট সুবিধা হয়েছে যে যদি বিস্তৃত গণ-বিক্ষোভ বা বিপ্লবের ফলে শাসনকার্যের নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটে, তাহ'লে এই সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থে বৃটিশ শাসন বজায় রাখার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকবে।"

—(Lord William Bentinck,—Speech on November 8, 1829, reprinted in A. B. Keith's "Speeches and Documents on Indian Policy, 1750-1921, Vol I,P. 215)

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, ভারতের বুকে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার সামাজিক ভিত্তি হিসাবে বৃটিশ শাসককে সৃষ্টি করতে হয়েছে এই জমিদারী প্রথা। এর সাথে বৃটিশের মিতালি আজো অটুট রয়েছে ; কিন্তু এ মিতালি ইংরাজ শাসনকে এক অচ্ছেদ্য বিরোধ-সঙ্কুল বন্ধনজালে জড়িয়ে ফেলেছে; এবং এই বন্ধন আজ জমিদারী প্রথার পক্ষে— ও তার সাথে বৃটিশ শাসনের পক্ষেও মারাত্মক হয়ে উঠেছে। আজ যখন প্রতি প্রদেশে ভারতের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছে, তখন দেখা যায় জমিদারী-সভা প্রভৃতি জমিদারদের প্রতিষ্ঠানগুলি বৃটিশ শাসনের প্রতি

অক্ষয় আনুগত্য জানাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় জমিদার-সঙ্ঘের সভাপতি বড়লাটের কাছে এক মান-পত্রে জানাচ্ছেন, "আপনি জমিদারদের আন্তরিক সাহায্য ও পূর্ণ সমর্থন পাইবার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।"

জমিদারদের একটা নিজস্ব সমিতি গঠন করার প্রাথমিক সূচনা হিসাবে ১৯৩৮ সালে নিখিল ভারত জমিদার মহাসভার প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতি মৈয়মনসিংহের মহারাজা তাঁর বক্তৃতায় যে কথা বলতে চেয়েছেন তার প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল এই যে "আমরা যদি শ্রেণী হিসাবে বাঁচতে চাই তাহ'লে আমাদের কর্তব্য হবে সরকারকে শক্তিশালী ক'রে তোলা।" ১৯৩৫ সালে যে নতুন শাসনতন্ত্র ভারতে প্রবর্তন করা হয় তাতে জমিদারদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং প্রাদেশিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় উভয় পরিষদেই তাদের জন্য আলাদা আইনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অবশ্য পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো ভুল পন্থা আর কোথাও অনুসরণ করা হয়নি। সরকার যাতে মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝে দাবী বাড়াতে পারে, সেই জন্য পরবর্তী ভূমি-ব্যবস্থাগুলি সাময়িক ভাবে করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা মাদ্রাজেই প্রথম শুরু করা হয়। সরকার সরাসরি প্রত্যেক চাষীর সঙ্গে সাময়িক ভাবে ব্যবস্থা করবে—এই ছিল এই নীতির মূল কথা। মূল উদ্দেশ্যও স্পষ্ট—কারণ, এতে চাষী ও

সরকারের মধ্যে লাভের ভাগ নেওয়ার জন্য আর কেউ ভাগীদার থাকবে না। এই ব্যবস্থার নাম রায়তওয়ারী প্রথা। ১৮০৭ সালে স্যর টমাস মুন্‌রো এই ব্যবস্থা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে চালাতে চেষ্টা করেন। ১৮২০ সালে তিনি যখন মাদ্রাজের গভর্ণর ছিলেন তখন মাদ্রাজের অধিকাংশ যায়গায় তিনি এই রায়তওয়ারী প্রথা চালু করেন এবং প্রথমে চিরস্থায়ী ভাবেই করেন। পরে অন্যান্য প্রদেশেও এই প্রথা চালু হয়ে যায় ও আজকের দিনে বৃটিশ ভারতের অর্দ্ধেকের বেশির ভাগ অঞ্চলে এই প্রথাই চলছে।

মুন্‌রো সাহেব বলতে চেয়েছিলেন যে এই প্রথাই নাকি ভারতের আগেকার ব্যবস্থার সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। প্রত্যেকটী চাষীর সঙ্গে আলাদা ক'রে ব্যবস্থা করা, উৎপন্ন ফসলের অংশের দিকে না তাকিয়ে জমির পরিমাণ ও টাকা-পয়সার হিসাবে খাজনা ধার্য করা মোটেই ভারতীয় প্রথা ছিল না। ভারতীয় ভূমি-ব্যবস্থাকে জমিদারী প্রথা যে-ভাবে নষ্ট করেছে এই রায়তওয়ারী প্রথাও সেই তুলনায় কিছু কম করেনি। আর ঠিক এই কারণেই মাদ্রাজের রেভেনিউ বোর্ড এই প্রথার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল লড়াই করে এবং হেরে যেতেও বাধ্য হয়। এই বোর্ড গ্রাম্য সম্প্রদায়ের সহযোগে সমষ্টীগত ভাবে খাজনা ধার্য-ও-আদায়ের ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আর্জি পেশ করে। এদের ব্যবস্থাটাকে মৌজাওয়ারী ব্যবস্থা বলা হয়। এই ব্যবস্থার স্বপক্ষে এবং রায়তওয়ারী প্রথার

বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিয়ে এই বোর্ড যে মন্তব্য করে, তা উল্লেখযোগ্য। তাদের বক্তব্যের মর্ম হ'ল এই ঃ —এই নব অধিকৃত বিরাট দেশ—যেখানে বহু বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি অনুসারী লোক বাস করে—সেখানকার প্রকৃত সম্পদ বা ভূমি-ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপ না জেনে, অতি অল্পসংখ্যক বিদেশী বিজয়ী শাসক সম্প্রদায়, এর অধিকার পাওয়া মাত্রই ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব নতুন পন্থা অবলম্বন করছেন, তা এমনি অসম্ভব যে অত্যন্ত উন্নত ইউরোপীয় দেশ গুলিতে—যেখানে ভালো ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্ আছে এবং যেসব দেশে শাসক ও শাসিতদের মধ্যে পার্থক্য নেই—সেই সব দেশেও এই ব্যবস্থাগুলোকে নিতান্ত অবাস্তব ও খেয়াল-প্রসূত ব'লে মনে হবে। নবপ্রবর্তিত যে ব্যবস্থা হ'ল তাতে প্রদেশ বা জেলা বা গ্রাম বা এষ্টেট হিসাবে খাজনা ধার্য হ'ল না ; বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের প্রতি-খণ্ড জমি হিসাবে খাজনা ধার্য করাই হ'ল নতুন ব্যবস্থার বিরাট অপকীর্তি ! শাসকদের এই তথা-কথিত 'উন্নত' ব্যবস্থা অনুসরণ করার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই ভারতের সাধারণতন্ত্রমূলক গ্রামগুলির পুরাতন বন্ধন আলগা ক'রে দিচ্ছে,—যে-জমি অনাদিকাল ধ'রে গোটা গ্রামের সম্পত্তি ছিল, তাকে আলাদা ক'রে নতুন কায়দায় বিলি ব্যবস্থা করছে,—'নির্দিষ্ট হারে খাজনা ধার্য করবো' ব'লে এত বেশি ক'রেই ধার্য করছে যা কখনও আদায় হতে পারে না,—নিজেদের খুশীমতো রায়তের

উপর খাজনা ধার্য করছে,--পূর্বগামী মুসলমান শাসকদের মতো রায়তকে জোর ক'রে লাঙ্গলে বেঁধে রাখছে,—অতিরিক্ত খাজনার জমিতে চাষ করতে তাকে বাধ্য করছে, যদি সে জমি ছেড়ে পালায় তাহ'লে তাকে ধ'রে এনে আবার জমিতে লাগিয়ে দিচ্ছে,—তারপর যতদিনে ফসল না হবে ততদিন চুপ ক'রে থেকে ফসল হ'লেই যতটা পারে আদায় ক'রে নিয়ে চাষীকে সুধুমাত্র তার বলদ ও বীজশষ্য রেহাই দিচ্ছে। (অনেক সময় গরু ও বীজশষ্যের সম্বলও চাষীর থাকে না; সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে সরকার নিজের লাভের জন্য—চাষীর জন্য নয়—চাষীকে এই দুটী জিনিষ যোগান দিয়েও চাষীর এই প্রাণান্তকর চাষবাসের কাজ চালু রাখছে। (Minute of the Madras Board of Revenue January 5, 1818)

স্থানীয় কর্মচারীদের উল্লিখিত যুক্তিতে কর্ণপাত করা হয় নি। লণ্ডনের পরিচালক সভা (Board of Directors—East India Company) কৃষকদিগকে "ব্যক্তিগত সম্পত্তির রসাস্বাদনে অধিকারী করতে" রায়তওয়ারী প্রথার পক্ষেই মত দিলেন; এবং তাদের সম্মতিতে শক্তিশালী হয়ে মুনরো সাহেব লণ্ডন থেকে ফিরে এসে এই ব্যবস্থা সাধারণ ভাবে চালু করলেন।

তাই আজ বৃটিশ ভারতে, বৃটিশ সরকারের অবলম্বিত উপায়ে এবং বৃটিশ সরকারই জমির চূড়ান্ত মালিক এই হিসাবে—ভূমি-ব্যবস্থা তিন রকমের হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম হ'ল ঃ চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা;—বৃটিশ অধিকৃত সমস্ত জমির শতকরা

১৯ ভাগে,—বাংলা, বিহার ও উত্তর-মাদ্রাজের কিছু অংশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত।

দ্বিতীয় হ'ল : সাময়িক ভাবে জমিদারী ব্যবস্থা ;—বৃটিশ ভারতের সমস্ত জমির শতকরা ৩০ ভাগ জমিতে,—যুক্তপ্রদেশের অধিকাংশ যায়গায়, মধ্যপ্রদেশে, বোম্বাই ও বাংলার কিছু অংশে এবং পাঞ্জাবে এই প্রথা প্রচলিত।

তৃতীয় হ'ল : রায়তওয়ারী প্রথা ;—বৃটিশ ভারতের শতকরা ৫১ ভাগ জমিতে,—বোম্বাই, বেরার, সিন্ধু, আসাম, মাদ্রাজের অধিকাংশে ও অন্যান্য যায়গায় এই ব্যবস্থা প্রচলিত।

কৃষকের অধিকার হরণ

অবশ্য, এই হিসাব অনুযায়ী কেউ যদি ধারণা করেন যে জমিদারী ব্যবস্থা বৃটিশ ভারতের সমস্ত জমির শতকরা ৪৯ ভাগে বর্তমান, তাহ'লে ভুল করা হবে। কারণ, নানা স্বত্ব ও উপস্বত্বের ভিতর দিয়ে ও মহাজন-শাহুকারের জুলুমে রায়তরা জমিহারা হওয়ায় রায়তওয়ারী ভূ-ভাগের অধিকাংশ জমিই জমিদারদের কবলে প'ড়ে জমিদারীভুক্ত হয়েছে। জমি রায়তের হাতে রাখার সদুদ্দেশ্য থাকলেও তা এইভাবে ব্যর্থ হয়েছে। জমি যে চষে তার সঙ্গে জমির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ঘুচে গেছে। হিসাব ক'রে দেখা গেছে যে "বোম্বাই ও মাদ্রাজের শতকরা ৩০ ভাগ জমিই প্রজারা নিজেরা চাষ করতে পায় না।"
("Land Problems of India"—Mukherjee, P. 329)

১৯০১ সাল থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে মাদ্রাজে যারা জমির মালিক অথচ চাষ-বাস করে না—এমনি লোকের সংখ্যা হাজারে ১৯ থেকে বেড়ে ৪৯ হয়েছে; প্রকৃত চাষী-মালিকের সংখ্যা হাজারে ৪৮৪ থেকে ক'মে ৩৮১ হয়েছে; আর অন্যের জমিতে যারা চাষ-বাস ক'রে খায়—তাদের সংখ্যা হাজারে ১৫১ থেকে বেড়ে ২২৫-এ উঠেছে। ১৯২১ সালে পাঞ্জাব আদমসুমারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, যারা কৃষি-জমির খাজনা-আয়ের উপর নির্ভর করে—তাদের সংখ্যা ১৯১১ সালে ৬২৬,০০০ থেকে ১৯২১ সালে ১,০০৮,০০০-তে বেড়েছে। ১৮৯১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে এই ধরণের বিত্তভোগী লোকের সংখ্যা যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৪৬ হিসাবে এবং মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে শতকরা ৫২ হিসাবে বেড়েছে! এই তথ্যের বিবেচনা অনুসারে সারা ভারতের অর্থনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ বলতে হবে। কারণ, দেখা যাচ্ছে যে অত্যন্ত দ্রুতবেগে জমিদারী প্রথা ছড়িয়ে পড়ছে, কৃষক জমির মালিকানা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, টাকা খাটাবার জন্য শিল্প ব্যবসা বা অন্য কোনো উপায় না থাকায় ভারতের ছোট বড় সব রকম ধনীই লাভের আশায় কৃষি-আয়ের উপর ঝুঁকে পড়ছে। দেশের অনেক যায়গায় যে বেশি-না-হোক অন্তত ৫০ জন মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি হয়েছে—এ এক অভাবণীয় মারাত্মক ব্যাপার। সরকারী কমিশনের অনুসন্ধানেও একথা স্বীকৃত হয়েছে: "কতকগুলি জেলার মধ্যস্বত্বের সংখ্যা আশ্চর্য রকম ভাবে বেড়ে গিয়েছে, উপরে জমিদার ও নীচের প্রকৃত

চাষীর মধ্যে অন্তত ৫০ জন মধ্যস্বত্বভোগী দেখা যায়।" (Simon Report, Vol. 1, P. 340)

ফলে, প্রকৃত চাষীদের রক্ষা করার জন্যও যদি কোনো প্রজা-স্বত্ব বিষয়ক আইন প্রণয়ন করা হয়, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত চাষীর সাহায্যে না এসে মধ্যস্বত্বভোগীদেরই স্থবিধা ক'রে দেয়। আর প্রকৃত চাষী—যারা এখনও জমিহীন মজুরে পরিণত হয় নি—তারা, সরকার ও জমিদারদের দাবী পূরণ করার পরেও একদল নিষ্কর্মা মধ্যস্বত্বভোগীদের পেট ভরাতেই সর্বস্ব খোয়াতে বাধ্য হচ্ছে। এইভাবে জমিদারীপ্রথার চরম অসঙ্গতিপূর্ণ বিকাশে ভারতের ক্রম-বর্ধমান কৃষি-সঙ্কট তীব্রতম রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফলে, শ্রেণী-বিভেদও তীব্রতর হয়ে দেখা দিচ্ছে। ১৯৩১ সালের আদমস্থুমারী রিপোর্টে দেখা যায় যে :

বিত্তভোগী মালিক (চাষ করে না অথচ খাজনা নেয়)	...	৪,১৫০,০০০
চাষী মালিক, প্রজা ...	...	৬৫,৪৯৫,০০০
কৃষি মজুর ...	...	৩৩,৫২৩,০০০

সরকার প্রদত্ত এই শ্রেণী-বিভাগের অবশ্য বেশি দাম নেই। কারণ, 'চাষী-মালিক বা প্রজা' বলতে তাদের জমির পরিমাণ কিছুই জানা যায় না—ফলে ধনী চাষী, মধ্যবিত্ত চাষী ও গরীব চাষীদের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা ধরা পড়ে না। এ ছাড়াও, চাষী মালিকদের বেশির ভাগ লোক, যাদের জমির অত্যল্প ফসলে খাওয়া-পরা কুলায় না ব'লে অন্য কোথাও

মজুরী করতে হয়—তাদের কথা উপরের শ্রেণী-বিভাগে ধরা পড়ে না। বস্তুত, ছোট ছোট চাষীদের সঙ্গে মজুরের পার্থক্য প্রায় নেই বল্লেই চলে। সুতরাং, প্রকৃত ব্যাপার জানতে হ'লে সরকারী আদমস্থুমারী রিপোর্ট-এর সঙ্গে স্থানীয় সরকারী ও বে-সরকারী অনুসন্ধানের ফলাফলকে মিলিয়ে দেখতে হবে।

আধুনিক আদমস্থুমারী রিপোর্টে যে-ভাবে শ্রেণী-বিভাগ করা হয় তাতে পুরানো রিপোর্টের সঙ্গে তুলনা করা মুস্কিল। ১৯২১ সালের রিপোর্টে চাষ-বাসের দ্বারা যারা জীবিকা নির্বাহ করে—এবং তাদের উপরেও যারা আবার নির্ভর করে—এদের মোট জনসংখ্যা দেওয়া আছে ২২ কোটি ১০ লাখ; ১৯৩১ সালে দেখা গেল, এটা ১০ কোটি ৩০ লাখে দাঁড়িয়েছে। অতএব ঠিকমতো তুলনা করতে হ'লে ১৯২১ সালের রিপোর্টে যাদের "প্রকৃত চাষী" ব'লে উল্লেখ ক'রে ১০ কোটি সংখ্যা নির্দেশ করা আছে—তাদের সঙ্গে ১৯৩১ সালের ১০ কোটি ৩০ লাখের তুলনা করতে হয়। এ ছাড়াও দেখা যাবে, "গৃহস্থালীর কর্মে নিযুক্ত" ব'লে ৭০ লাখ কৃষক-স্ত্রীলোক—যারা প্রকৃতভাবে ক্ষেত-খামারে সাহায্য করে—তাদেরকে এবং, আরো অন্যান্য লোক—যারা ঠিক চাষ না করলেও নানা ভাবে সুধু চাষ-আবাদের সাহায্যেই লাগে—তাদেরকে অন্য শ্রেণীতে ফেলে দিয়ে বাহ্যত দেখানো হয়েছে যে কৃষি-কর্মের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ক'মে যাচ্ছে। এবং এইভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে:

	১৯২১	১৯৩১
অ-চাষী মালিক	৩৭ লাখ	৪১ লাখ
চাষী মালিক বা প্রজা	৭ কোটী ৪৬ লাখ	৬ কোটী ৫৫ লাখ
	২ কোটী ১৭ লাখ	৩ কোটী ৩৫ লাখ

পূর্বোক্ত কারণে এই সংখ্যাগুলির সঙ্গে অন্য-কিছুর যাচাই করা চলেনা। তবে, এটা সকলেই স্বীকার করে যে একদিকে যেমন অসংখ্য ভূমিহীন কৃষক বেড়ে যাচ্ছে, অপরদিকে তেমনি কৃষিকার্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন জমিদারের সংখ্যাও বাড়ছে। মাদ্রাজের কৃষি-ব্যবস্থায় শ্রেণী-বিভাগ লক্ষ্য করলে এই ব্যাপারের খানিকটা বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

(কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার প্রতি হাজারে)

	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
অ-চাষী মালিক	১৯	২৩	৪৯	৩৪
অ-চাষী প্রজা	১	৪	২৮	১৬
চাষী মালিক	৪৮৪	৪২৬	৩৮১	৩৯০
চাষী প্রজা	১৫১	২০৭	২২৫	১২০
কৃষি-মজুর	৩৪৫	৩৪০	৩১৭	৪২৯

(১৯০১ থেকে ১৯২১ সালের সংখ্যাগুলি P. P. Pillai-এর Economic Conditions in India-র ১১৪ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া এবং ১৯৩১ সালের সংখ্যা মাদ্রাজ সেন্সাস রিপোর্ট থেকে নেওয়া)।

এতে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিশ বছরের মধ্যে অ-চাষী জমিদার সম্প্রদায় ২০ থেকে ৫০ হয়েছে—অর্থাৎ ২-১/২ গুণ

বেড়েছে, চাষী মালিক ১/৪ ভাগ কমেছে এবং জমিহীন কৃষি-মজুর হাজার-করা ১/৩ অংশ থেকে বেড়ে ১/২ হয়ে গেছে।

বাংলার সেন্সাসের ভিত্তিতে দেখা যায়ঃ

	১৯২১	৯৩১	ফলাফল
খাজনার উপর নির্ভরশীল জমিদার	৩৯০,৫৬২	৬১১,৮৩৪	৬১% বেড়েছে
চাষী মালিক বা প্রজা	৯,২৭৪,৯২৪	৬,০৭৯,৭১৭	— ৫০% কমেছে
মজুর	১,৮০৫,৫০২	২,৭১৮,৯৩৯	+ ৩৪% বেড়েছে

এই সব হিসাব-নিকাশে নানা রকম ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সবদিককার সংখ্যা থেকে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে একদিকে যেমন কৃষকদের শোষণ ক'রে জমিদার শ্রেণীর লোকসংখ্যা ক্রমশ ফেঁপে বেড়ে যাচ্ছে, অপর দিকে তেমনি ভূমিহীন কৃষি-মজুরদেরও সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ১৮৪১ সালে স্যর টমাস মুনরো সেন্সাস কমিশনার হিসাবে খবর দিয়েছিলেন যে ভারতে জমিহীন কৃষি-মজুর নেই। তখন-যে কথাটা অতখানি সত্য ছিল তা আমাদের মনে হয় না,—তবে এইটুকু বিশ্বাস করা যায় যে এত কম সংখ্যা ছিল যা হয়তো উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৮৮২ সালেই সেন্সাস ৭৫ লাখ ভূমিহীন দিন-মজুরের সংখ্যা নির্দেশ করল। ১৯২১ সালের সেন্সাসে দেখা গেল, এই সংখ্যা ২ কোটী ১০ লাখে দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ যত লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত তাদের ১/৫ অংশ হয়েছে। ১৯৩১ সালের

সেন্সাসে ৩ কোটী ৩০ লাখ—অর্থাৎ কৃষিকার্যে নিযুক্ত লোকদের ১/৩ অংশই ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়েছে। এর পরে ১৯১৮ সালে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের আলোচনায় বঙ্গীয় আইন সভায় বলা হয়েছে যে প্রায় অর্ধেক চাষীই ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়েছে। একটু আগে মাদ্রাজের যে-সংখ্যা উদ্ধৃত করেছি, তাতেও এই উক্তি সমর্থিত হয় এবং Indian Journal of Economics, (July, 1939)-এ মিঃ এম, সরকার কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ—Economic Conditions of a Village in North Behar-এ দেখা যায়, উক্ত গ্রামের মধ্যে ভূমিহীন কৃষি-মজুরের সংখ্যা প্রায় শতকরা ৭২ ভাগ। সুতরাং বিহারের সাধারণ অবস্থা বাংলার অনুরূপই বলতে হবে।

এই সব কৃষি-মজুরেরা কত মজুরী দিনে পায়—তাও দেখাচ্ছি। বিভিন্ন সময়ে শ্রমের দাম এবং সঙ্গে সঙ্গে চাউলের দাম কী হারে বাড়ছে, তা লক্ষ্য করবার বিষয়।

	১৮৪২	১৮৫২	১৮৬২	১৮৭২	১৯১১	১৯২২
আপ-খোরাকী						
ক্ষেত-মজুরের রুজী	/০	/১০	৵০	৶০	।০	।০ থেকে ।৵০
টাকায় চাউলের সের	৪০	৩০	২৭	২০	১৫	৫

(R. Mukherjee, "Land problems of India," p. 222)

এমনি ক'রে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে, নগদা মজুরীর হার যখন কমপক্ষে ৪ গুণ ও বেশিপক্ষে ৬ গুণ মাত্র বেড়েছে, তখন চালের দাম বেড়েছে একেবারে ৮ গুণ ; অর্থাৎ

এই ৮০ বছরের "উন্নতির" ফলে প্রকৃত মজুরী, আগে যা ছিল তা থেকে, কমপক্ষে সিকি অংশ ও বেশিপক্ষে অর্ধেক অংশ ক'মে গিয়েছে। ১৯৩৪ সালের Quinquennial Wage Survey Report-এ জানা যায়, যুক্ত প্রদেশের গড়পড়তা রোজ-মজুরী তিন আনা মাত্র; তার মধ্যে আবার ৩২৬ খানা গ্রামের হিসাব হচ্ছে, মাথাপিছু মোটে ছু'পয়সা রোজ।

এ তো গেল যাদের কথা হিসাবে পাওয়া যায়। কিন্তু আরো তলার খবর যদি নেওয়া যায় তবে দেখা যাবে, গোলামির অন্ধ-গুহায় কত অসংখ্য ভূমিহারা মজুরের দল!—জোর ক'রে তাদের খাটিয়ে নেওয়া হয়, দেনার দায়ে তাদের কেনা দাস ক'রে রাখা হয়—মজুরী বলতে কী তা তারা জানেও না;—সরকারী নথি-পত্রে তাদের কথা চিরকাল সাদাকালিতেই লেখা হয়ে আসছে।

এমনি দাসত্বমূলক প্রথা সারা ভারতে চলছে। রাধাকমল মুখার্জী নিখিল ভারত কৃষক সভার লোক নন, অথচ তিনিও তাঁর Land Problems of India-র ২২৫-৯ পৃষ্ঠায় বলেছেন:

"ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের শেষ ধাপে একদল চিরস্থায়ী কৃষি-মজুর রয়েছে, যারা কদাচিৎ মজুরী হিসাবে টাকাকড়ি পায় এবং যাদের অবস্থা খাঁটি দাসত্বের অবস্থা থেকে সামান্যই পৃথক। এদেশের জমিদার, মালগুজার বা অবস্থাপন্ন চাষীরা একটা প্রথা মেনে চলে, সেটা হচ্ছে এই, তাদের চাকর-বাকরকে এমনি ভাবে ঋণগ্রস্ত করায় যাতে তারা বংশানুক্রমে জমিদারের অধীনে থাকতে বাধ্য হয়।

"বোম্বাই প্রদেশে 'দুব্‌লা' ও 'কোলি' সম্প্রদায় প্রায় দাস হয়ে গেছে বল্লেই চলে। এরা সপরিবারে বংশানুক্রমে তাদের প্রভুদের গৃহস্থালীতে কাজ ক'রে আসছে—ঠিক দাসেরই মতো।

"মাদ্রাজের দক্ষিণ-পশ্চিমে ইজাভা, চেরুমা, পুলেয়া এবং হোলিয়া সম্প্রদায় প্রকৃত দাস হয়ে গেছে। মাদ্রাজের পূর্বে সমুদ্রের তীরবর্তী যায়গায় জমির উপর ব্রাহ্মণদের অধিকার প্রবল এবং এখানকার অধিকাংশ কৃষি-মজুরদের 'পারিয়া' বা 'পাড়িয়াল' বলা হয়। পাড়িয়াল হ'ল দাসদের এমন-এক জাতি যারা দেনার জন্য যে-কোনো জমিদারের কাছে বংশানুক্রমে বাঁধা পড়েছে। ...এই দেনা কখনও শোধ দেওয়া তো যায়ই না, বরং বংশানুক্রমে চলতে থাকে; এবং পাওনাদার যদি জমি বিক্রী ক'রে দেয় বা ম'রে যায়—তাহ'লে তার জমির মালিক যে হবে পাড়িয়ালদের মালিকও সেই হবে।...

"দাসত্বের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে বিহারের 'কামিয়া' সম্প্রদায়,—যারা দেনার সুদ উস্থল দেওয়ার জন্য পাওনাদারের কথামতো যে-কোনো কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ হয়।"

দেশের অনেক যায়গায় এই সকল চাষী গোলাম বা দেন্‌দার গোলামরা আদিম জাতির লোক। কিন্তু যে সকল কৃষকেরা এককালে স্বাধীনভাবে চাষ-বাস করত, তারা আজ জমিচ্যুত হয়ে, দেনার দায়ে পাওনাদারের কাছে যে-কোনো কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে, অথবা ভাগরা প্রথা অনুযায়ী জমির

ফসলের সামান্য অংশমাত্র নিয়ে প্রায় খাঁটি দাসত্বের পর্যায়ে নেমে এসেছে।

এদেরই সমান অবস্থায় রয়েছে কুলি-গোলামের দল, যারা চা-বাগানে কফি ক্ষেতে ও রবার চাষে কাজ করে। এদের সংখ্যা প্রায় লাখের বেশি হবে। চা কফি ও রবারের কারবারগুলির শতকরা ৯০টাই ইউরোপীয় কোম্পানীর। এরা মোটা টাকা লাভ করছে। এদের জন্য সারা ভারতবর্ষ থেকে লোক সংগ্রহ হচ্ছে।—চা-বাগানের কুলি জোগাড় করা 'আড়কাটির' কথা শুনলে অসহায় কৃষক পিতামাতার বুকের রক্ত এখনও শুকিয়ে ওঠে। একটা লোকই হোক বা একটা গোটা পরিবারই হোক, সকলকেই কোম্পানীর অধীনে কড়াশাসনে বাস করতে হবে—ব্যক্তি-স্বাধীনতার অত্যন্ত মামুলী অধিকার গুলিও এরা পাবে না। এখানে অত্যন্ত কম পয়সা দিয়ে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদের শোষণ করা হয়;—১৯৩০ সালের হুইট্‌লে রিপোর্টের ফলে আজীবন-চুক্তির প্রথা আইন ক'রে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বটে কিন্তু কুলিরা এখনও দীর্ঘদিনের জন্য এবং কার্যত সারা জীবনের জন্যই মালিকদের কবলে কঠিনভাবেই আবদ্ধ থাকে।

এতক্ষণ আমরা ব'লে এসেছি যে, সমস্ত কৃষক-জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই ভূমিহীন কৃষি-মজুরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু অল্প-স্বল্প জমির অধিকারী গরীব চাষীদের অবস্থা ওদের থেকে এমন কিছু বেশি ভালো নয়। ১৯৩০ সালে

মাদ্রাজের ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটি এই মন্তব্য সমর্থন করেছে। ১৯২৭ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে এন্, এম, যোশী দেখান যে, সুধু কৃষিকার্য থেকে মজুরী পায় এমন লোকের সংখ্যা আড়াই কোটি; আর ৫ কোটি লোক আছে যারা কৃষি-মজুরের কাজও করে এবং অন্য কাজও করে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ কৃষকেরাই অল্পস্বল্প জমির মালিক থেকে গ্রামের সর্বহারা হওয়ার পথেই এগিয়ে চলেছে।

১৯৩০ সালে সাইমন রিপোর্ট অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো মন্তব্য করেছেঃ "খাঁটি চাষী বলতে এখনও তাকেই বুঝায় যার একজোড়া বলদ আছে এবং যে পারিবারিক লোকের সহযোগে ও কখনও বা ২/১টী ভাড়াটে মজুর খাটিয়ে একর ক-এক জমি চাস-বাস করে।" (Simon Report, Vol. I, p. 18)

আমরা এতক্ষণ যে সকল তথ্য উপস্থিত করেছি, তার থেকে এই কথাটা নিশ্চয় আশ্চর্য রকমের লাগবে।—বোম্বাই প্রদেশের একটা জেলা, ১০ লাখ একর তার জমির পরিমাণ, তার অবস্থা বলা হয়েছে "অন্যান্য জেলার চেয়ে অনেক ভালো"; সেই জেলা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ১৯২৭ সালে কৃষি কমিশনের সামনে নিম্নলিখিত সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৯১৭ থেকে ১৯২২ সাল—এই পাঁচ বছরে কৃষকের অধিকৃত জমার পরিমাণ কী রকম ক'মে এসেছে—তা লক্ষ্য করার ব্যাপার। (Agricultural Commission, 1927, Vol. II, Part I of Evidence, p. 292)

প্রত্যেক হোল্ডিং-এ জমির একর	বৎসরে হোল্ডিং এর সংখ্যা		শতকরা কত বেশি বা কম হ'ল।
	১৯১৭	১৯২২	
৫ একরের কম	৬,২৭২	৬,৪৪৬	+২.৬
৫ থেকে ১৫ একর	১৭,৯০৯	১৯,১৩০	+৬.৮
১৫ ,, ২৫ ,,	১১,৯০৮	১২,০১৮	+০.৯
২৫ ,, ১০০ ,,	১৫,৫৩২	১৫,০২০	–৩.৩
১০০ ,, ৫০০ ,,	১,২৩৪	১,১১৭	–৯.৫
৫০০ একরের উপর	২০	১৯	–৫.০

এ সাক্ষ্য যিনি দিয়েছিলেন—তিনি একজন সরকারী কর্মচারী। তিনি এর উপর মন্তব্য করছেন: "মাত্র পাঁচটী বছরের অল্প সময়ের হিসাবেই দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। ১৫ একর জমির বেশি তাদের কেউ আবাদ করে না। দু-এক খণ্ড ভালো জমির কথা বাদ দিলে, এদের আবাদী জমির পরিমাণ এমন কিছু নয়, যাতে একজোড়া বলদ খাটিয়ে লাভের দিক দিয়ে পোষানো যায়। ...যেসব চাষীর আবাদে ২৫ থেকে ১০০ একর জমি ছিল, তাদের সংখ্যাও ক'মে আসছে।—অর্থাৎ, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন চাষী, যারা দৈবাৎ দু-এক পয়সা পুঁজির সাশ্রয় করতে পারত, তারাও ক'মে গেল।"

১৯২২ সালের মধ্যেই এই ভাবে জমি বেরিয়ে যেতে যেতে ছোট চাষীদের হাতে যেটুকু বাকী রইল তাতে শতকরা ৫০ জনও

এক জোড়া বলদ পোষার খরচা তুলতে পারে না। এখানে ভূমিহীন কৃষকদের কথা তো তোলাই হ'ল না।

এই সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে প্রতি কৃষকের হাতে কতখানি ক'রে জমি আছে সেটা না জানতে পারলে কোনো প্রকৃত বিচারই সম্ভব নয়।

ডাঃ হ্যারল্ড ম্যানের লেখা "Life and Labour in a Deccan village"— বই-এ এই বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা আছে। ডাঃ ম্যান বোম্বাই সরকারের কৃষি পরিচালক (Director of Agriculture) ছিলেন। ১৯১৪-১৫ সালে দাক্ষিণাত্যের একটী সাধারণ গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বিশদভাবে অনুসন্ধান করেন। এই "খটখটে" গ্রামের চাষবাসের অবস্থা, ফসলের বিবরণ, জমার আয়তন, কৃষকের দেনা, আয় ও ব্যয় সম্পর্কে এই রকম চমৎকার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আর কখনও কোথাও হয় নি। এই অনুসন্ধানের ফল এতই আতঙ্কজনক যে সমালোচকদের মতে ঐ গ্রামখানাকে আর পাঁচখানা গ্রামের পর্যায়ে ফেলা যায় না। —ম্যান সাহেবের কাছেও অনুসন্ধানের এই সাঙ্ঘাতিক ফল 'অপ্রত্যাশিত' ও 'নৈরাশ্যজনক' ব'লে মনে হয়েছে। এই কারণে তিনি আর একখানা গ্রাম নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন এবং ১৯২১ সালে যখন তার ফলাফল প্রকাশ হ'ল, তখন দেখা গেল সেগুলি আরো ভয়াবহ। তারপর থেকে এমনি ধরণের এক-একটা গ্রাম নিয়ে অনুসন্ধান চলেছে এবং সব ক্ষেত্রেই পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলিই সমর্থিত হয়েছে।

প্রথম গ্রামে অনুসন্ধানের পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে "জমাগুলির শতকরা ৮১ ভাগ ভালো ফসলের বছরেও তার মালিকের ভরণ-পোষণ যোগাতে পারে না"। ১৫৬টা জমা ভাগ ক'রে দেখা গেল যে,

৩০ একরের উপরে	...	জমা	২
২০ থেকে ৩০ একর	...	...	৯
১০ ,, ২০	...	..	১৮
৫ ,, ১০	...	...	৩৪
১ ,, ৫	...	...	৭১
একরের কম	...	...	২২

মিঃ কিটিংসের হিসাব অনুসারে "দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলে যে ধরণের ভালো ডাঙ্গা জমি পাওয়া যায়, তাতে ভারতীয় কৃষকের জীবনযাত্রার নিম্নতম ব্যয় নির্বাহ করতে হ'লেও, অন্তত ১০ থেকে ১৫ একর জমি দরকার। সেই হিসাবে ডাঃ ম্যানের মন্তব্য হ'ল, শতকরা ৮১ ভাগ জমিই এই মাপের থেকেও ছোট। সুতরাং কৃষকের সর্বনিম্ন চাহিদা মেটানোর উপায় যেখানে হয় না—বিলাস ব্যসনের কোন প্রশ্নই সেখানে উঠতে পারে না। ১০৩টী পরিবারের হিসাব নিয়ে তিনি দেখতে পান যে ভরণপোষণের উপযোগী জমি মাত্র ৮টী পরিবারের আছে ;—২৮টী পরিবারের নিজেদের জমিদ্বারা ও বাইরে কাজকর্ম ক'রে অন্নের সংস্থান করতে হয় ; আর বাকী ৬৭টী পরিবার নিজের ক্ষুদ্র জমিতে পূরা আয় ছাড়াও অন্য যায়গায় মজুরী

খাটতে হয় এবং এত ক'রেও তাদের খাওয়া পরা জোটে না। যারা জমির পূরা আয় এবং অন্য যায়গায় খেটে মজুরী পেয়েও অস্বচ্ছল—তারা প্রায় শতকরা ৬৫ জন। অবশ্য এই গ্রামখানির পাশে একটা অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা থাকায় গ্রামের শতকরা ৩০ জন লোক ওখানে কাজ করতে পারত এবং সেই হিসাবে বরং বলা যায় যে গ্রামখানি ঠিক মামুলি চাষী গ্রাম নয়। তা সত্ত্বেও ঐ দুরবস্থা!

দ্বিতীয় গ্রামটীর পাশে বা নিকটে এমনি কোনো শিল্প কারখানা ছিল না—এবং গ্রামের শতকরা ৮৫ জনের অবস্থাই 'অস্বচ্ছল' ছিল। এই গ্রামের মোট জমার আয় হিসাবে ভাগ করলে প্রত্যেকের অন্তত ২০ একর জমি থাকা উচিত, কিন্তু শতকরা ৭৭ ভাগ জমাই তার কম। ১৪৭ ঘর পরিবারের মধ্যে জমি হিসাবে—"স্বচ্ছল" অবস্থাসম্পন্ন ছিল ১০ ঘর মাত্র; ১২ ঘর লোক জমির আয় ও বাইরের মজুরী দ্বারা কোনো রকমে ব্যয় নির্বাহ করত এবং ১২৫ ঘর অর্থাৎ শতকরা ৮০ ভাগের অবস্থাই জমির পূরা আয় ও বাইরের মজুরী পাওয়া সত্ত্বেও 'অস্বচ্ছল' ছিল। এই গ্রামের লোকসংখ্যা হচ্ছে ৭৩২ জন—কিন্তু শেষোক্ত বিভাগের লোক হচ্ছে ৬৬৪ জন;—অর্থাৎ জনসংখ্যার শতকরা ৯১ ভাগই 'অস্বচ্ছল' অবস্থায় জীবন নির্বাহ করে। এই 'অস্বচ্ছল' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে তাদেরই সম্পর্কে যাদের জীবিকানির্বাহের সর্বনিম্ন হারও জোটে না। —তাহ'লে জনসংখ্যার এই বিরাট অংশ

বেঁচে থাকে কী ক'রে? —বেঁচে থাকে দেনার উপর দেনা ক'রে; ফলে জমি হারায়— ভূমিহীন মজুরের দল বৃদ্ধি করে। এই অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছিল যে দেনার ফাঁশ কেমন ধীরে ধীরে গ্রামগুলির টুঁটি টিপে ধরছে। প্রথম গ্রামের অনুসন্ধানে জানা যায়, গ্রামটীর মোট বাৎসরিক আয় ৮,৩৩৮৲ টাকার থেকে বাৎসরিক দেনা সংক্রান্ত ব্যয় হয় ২,৬১৫৲ টাকা। দ্বিতীয় গ্রামটীর মোট বাৎসরিক আয় ১৫,৮০৭৲ টাকা থেকে বাৎসরিক দেনা বাবদ ৬,৭৫৫৲ টাকা দিতে হয় অর্থাৎ সমস্ত আয়ের ২/৫ অংশ মহাজনের কবলে যায়।

অনুসন্ধানের শেষে এসে ডাঃ ম্যান এই সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছান: "আমাদের অনুসন্ধানের ফলে যদি সত্যই গ্রামের কোনো প্রকৃত ছবি মিলে থাকে তো তাতে এই দেখা যায় যে, সচরাচর প্রতি বৎসরে গ্রামের লোক অর্ধভূক্তই থাকে এবং দিনে দিনে অধিকতর দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ে; তার ফলে এই সমস্ত লোকজন দিয়ে ও গতানুগতিক চাষ-বাসের পদ্ধতির সাহায্যে প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার পক্ষে এই গ্রামগুলি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে।

কৃষকের দেনার বোঝা

কৃষকের অস্বচ্ছলতা যতই বাড়ে সঙ্গে সঙ্গে তার ঋণের বোঝাও বাড়তে থাকে—ফলে, অস্বচ্ছলতার হাত থেকে তার আর কখনও মুক্তি জোটে না। এই সর্বনেশে গোলক ধাঁধার

শেষ পরিনতি হ'ল—কৃষকের সর্বস্ব লুণ্ঠন। তাই দেনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যারা কৃষক নয় তাদের কাছে জমি মর্টগেজ, বিক্রী ও হস্তান্তর করা হ'ল কৃষি-সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধির অন্যতম বিশিষ্ট কারণ।

"বিরাট কৃষক সম্প্রদায়ের অধিকাংশই মহাজনের কাছে দেনার দায়ে ডুবে আছে।" (Simon Report, Vol. I, p. 16)

এই দেনার বোঝা যে বৃটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়েছে এবং আজকালকার দিনে একটা অত্যন্ত জরুরী সমস্যায় পরিণত হয়েছে, এটা সর্ববাদীসম্মত। ১৯১১ সালে স্যর এডওয়ার্ড ম্যাক'লাগান মন্তব্য করেছেন: "ভারতে দেনার বোঝা যে নতুন নয় এটা অনেকদিন থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। মুনরো, এলফিনষ্টোন প্রভৃতির লেখা দেখে বেশ জানা যায় যে এমন কি আমাদের শাসনকালের গোড়াতেই এদেশের লোকের যথেষ্ট দেনা ছিল। কিন্তু এটাও আজ স্বীকার করা হয়েছে যে আমাদের শাসনকালে, বিশেষ ক'রে গত অর্ধশতাব্দী ধ'রে দেনাটা অত্যন্ত বেশি বেড়ে গেছে। সময় সময় যে সকল রিপোর্ট পাওয়া যায় তার থেকে, এবং বাৎসরিক জমিবিক্রী, মর্টগেজের সংখ্যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, গত অর্ধশতাব্দীতে দেনা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে।" (Sir Edward Maclagan in 1911, quoted in the Report of the Central Banking Enquiry Committee, 1931, p. 55)

এর আগেই ১৮৮০ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশন লিখেছিল

যে কৃষক শ্রেণীর দুই-তৃতীয়াংশ লোকই দেনার দায়ে বিকিয়ে আছে। এদের মধ্যে অর্ধেক লোক এমনি ডুবেছে যে তাদের উদ্ধারের কোন উপায়ই নেই। .এবং আর বাকী অর্ধেক কোনো রকমে রেহাই পেলেও পেতে পারে।

এই যুগের পর থেকে দেনা খাড়াই বেড়ে গেছে। ১৯২৯ সালে কৃষি কমিশন লিখেছে ঃ "এই শতাব্দীতেই-যে গ্রামের লোকের দেনার বোঝা বেড়েছে সেটা একরকম নিশ্চিত ; আগেকার তুলনায় বর্তমানে আয়-বৃদ্ধির সঙ্গে দেনার পরিমাণ বেড়েছে কি কমেছে, সে সম্পর্কে ঠিকমতো উত্তর আমরা পাইনি।"
—(Report of the Agricultural Commission 1928, p. 441)

দেনার পরিমাণ যে আসলে বেড়েছেই একথা সমর্থন করছে—সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনক্যোয়ারী কমিটির ১৯৩১ সালের রিপোর্টের ৫৫ পৃষ্ঠা। ১৯৩১ সালে সমস্ত দেনার পরিমাণ এই কমিটির অনুসন্ধান অনুযায়ী ১০০ কোটী টাকা। তারপর থেকে জগত জোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট ও কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য কম হওয়ার দরুণ এই দেনার পরিমাণ সাঙ্ঘাতিক ভাবে বেড়ে ১০০০ কোটী টাকা হয়েছে।

বৃটিশ শাসনে এবং বিশেষ ক'রে আধুনিক যুগে এইভাবে প্রচণ্ড দেনার বোঝা বাড়ার অর্থ কি? হালকা প্রকৃতির লেখক বা সরকারের সাফাই গায়করা কৃষকের এই দারুণ দেনার বোঝার কারণ দর্শাতে গিয়ে কৃষকের 'মন্দভাগ্য'—'অবিমৃষ্য-কারিতা'—'ব্যয়বাহুল্য'—মামলা-মকদ্দমা, বিয়ে, শ্রাদ্ধ বা

অনুরূপ সামাজিক অনুষ্ঠানে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করার যে স্বভাব তার দোষ দিয়ে থাকেন। প্রকৃত কারণ মোটেই তা নয়। ১৮৭৫ সালেই দাক্ষিণাত্য কৃষি-কমিশন মন্তব্য করেছে, "বিয়ে বা অনুরূপ উৎসবাদিতে যেসব খরচপত্র কৃষক করে, তাই নিয়ে বড় বেশি বলা হয়েছে,…এগুলি অবশ্য কৃষকের দেনা কিছুটা বাড়ায় বটে কিন্তু তার দেনার মূল কারণ তাই নয়।"

বাংলার প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং এনক্যোয়ারী কমিটি "গ্রামগুলি তন্ন-তন্ন অনুসন্ধান" ক'রে বলেছে যে পূর্বোক্ত কারণগুলি মূল কারণ নয়। উদাহরণ স্বরূপ, বগুড়া জেলার করিমপুর গ্রামের দেনা-দায়-গ্রস্ত ৫২টী পরিবারের ১৯২৮—১৯২৯ সালে যে দেনা করতে হয়েছিল, তার হিসাব ঐ রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত করা গেল :

পুরানো দেনা শোধ—	৩৮৯৲
পুঁজির উন্নতি, গবাদি পশু বাবদ খরচা—	১,০৮৭৲
জমির খাজনা—	৫৭৩৲
চাষবাসের খরচা—	৪৩৫৲
সামাজিক ও ধর্মানুষ্ঠানের খরচা—	১৫০৲
মামলা-মকদ্দমা—	১৬৲
অন্যান্য খরচ—	৬৬৲
	২,৭১৬৲

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক, ধর্মানুষ্ঠান ও মামলা-মকদ্দমার

বাবদ যা খরচ হয় তা সমস্ত ব্যয়ের ১/১৬ অংশ মাত্র। এই ব্যয়ের দ্বিতীয় দফার খরচ—যা মোট ব্যয়ের ২/৫ অংশ, তাকেই কেবল প্রকৃতপক্ষে উৎপাদক ঋণ বা উৎপাদনের জন্য ব্যয় ব'লে ধরা যায়। আর সব ব্যয়—অর্থাৎ, মোট ব্যয়ের প্রায় অর্ধেকই যায় খাজনা, দেনা ও চাষ-বাসের জরুরী দাবী মেটাতে।

১৯৩৩-৩৪ সালে অনুসন্ধানের ফলে বীরভূম জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশেও এই রকম নজির পাওয়া গেছে। এখানে ৬টী গ্রামের ৪২৬ ঘর পরিবারের মধ্যে ২৩৪ ঘর, অর্থাৎ শতকরা ৫৫টী পরিবার ঋণগ্রস্ত; এদের মোট ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৫৩,৭৯৯৲ টাকা;—অর্থাৎ গড়ে প্রতি পরিবার ২৩০৲ টাকা দেনায় জড়িত। দেনার কারণ নিম্নলিখিত খরচের দফায় দেখানো হচ্ছে:

	টাকা	শতকরা
খাজনা বাবদ	১৩,০০৭	২৪·২
পুঁজির উন্নতি বাবদ	১২,৭৩৬	২৩·৭
সামাজিক ও ধর্মনৈতিক উদ্দেশ্যে	১২,০২১	২২·৩
পুরানো দেনার শোধ	৪,৫০৩	৮·৪
কৃষিকার্যের জন্য	২,৪২৩	৪·৫
মামলা-মকদ্দমা	৭০৮	১·৩
অন্যান্য খরচ	৮,৪০১	১৫·৬

(S. Bose, "A Survey of Rural Indebtedness in South-

West Birbhum, Bengal, in 1933-34", Indian Journal of Statistics, September 1937)

এই হিসাব অনুযায়ী মোট দেনার এক-চতুর্থাংশ খাজনা বাবদ খরচ হচ্ছে ; এবং খাজনা আর দেনা একত্রে মিলিয়ে যা দাঁড়াচ্ছে, তা মোট খরচের এক-তৃতীয়াংশ ;—এক-চতুর্থাংশেরও কম গেল পুঁজির সংস্কার সাধন করতে ; আর সামাজিক বা ধর্মানুষ্ঠানের জন্য অন্য দফার তুলনায় বেশি ব্যয় হলেও, তা এক-পঞ্চমাংশের বেশি খরচ হয়নি। তাহ'লে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে আর্থিক প্রয়োজনেই বেশি দেনা করা হয়েছে, এবং যাতে আয় বাড়তে পারে তার জন্য যে দেনা করা হয়েছে তা অতি অল্পই।

এই হিসাব থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় চাষীদের দেনার কারণ হ'ল অর্থনৈতিক, এবং রাজস্ব ও খাজনার নিষ্ঠুর নিষ্পেষনের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পূর্বোক্ত অনুসন্ধানকারীর ভাষায় "ভারতীয় চাষীদের দেনার প্রধান কারণ হ'ল—তাদের সাধারণ দারিদ্র্য।" ১৮৭৯ সালে বোম্বাই-এর রেভেনিউ অফিসার স্যার টি, হোপ দাক্ষিণাত্যের কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশা কিছুটা লাঘব করার উদ্দেশ্যে একটী বিল উত্থাপন করেছিলেন, তার স্বপক্ষে তিনি বলেছিলেন : "কৃষকের দেনার জন্য আমাদের ত্রুটিপূর্ণ রাজস্ব-প্রথা অনেকখানি দায়ী।" ঐ বিল আইনে পরিণত হওয়ার পর যে কমিটি তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল,

সেই কমিটির রিপোর্টে আছেঃ "দাক্ষিণাত্যের কৃষকেরা নিত্য নতুন দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ছে ; তার প্রধান কারণ, বর্তমান রাজস্ব-প্রথার কড়াকড়ি, একথা নিঃসন্দেহ।" যে প্রথায় একটানা ত্রিশ বছর ধ'রে একটী নির্দিষ্ট হারে, ফসলের দিকে বা চাষীর অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে দৃকপাত না ক'রে, টাকাপয়সায় পাওনা আদায় হচ্ছে, সে প্রথা রাজস্ব আদায়কারীর পক্ষে এবং রাজস্ব-মন্ত্রীর বাজেট তৈরী করার পক্ষে সুবিধা-জনক হতে পারে—কিন্তু দেশের লোকের পক্ষে তাতে কোনো সুবিধাই নেই। কারণ, ফসলের অবস্থা সব সময়ে সমান হয় না এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাতেও নানা বিপর্যয় ঘটতে পারে ; সেইসব ক্ষেত্রে চাষীকে মহাজনের কাছে না গিয়ে উপায় থাকে না। সাময়িকভাবে খাজনা-আদায় রহিত ক'রে বা খাজনা মকুব ক'রে দুরবস্থার কিছুটা উপশম করা চলে বটে—কিন্তু এই প্রক্রিয়া তো তাতে লোপ পাবে না—ক্রমাগত চলতেই থাকবে। যে কমিশনের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি, সেই কমিশন পুণা জেলার কয়েকটী গ্রামে অনুসন্ধান ক'রে জেনেছেন, কী ভাবে সেই গ্রামের চাষীরা রাজস্ব দেয়। নিম্নে সেই অনুসন্ধানের ফলাফল সংক্ষেপে দেওয়া গেল ঃ

গ্রামের নাম ঃ	কী ভাবে রাজস্ব দেওয়া হয় তার বিবরণ ঃ
বেইবান্দ—	রাজস্ব দেওয়ার জন্য চাষীরা ঋণ করতে বাধ্য হয়।
পিম্পলগাঁও—	সুজন্মার বৎসরেও অল্পবিস্তর দেনা ক'রে রাজস্ব দিতে হয়।

দেউলগাঁও—	রাজস্ব দিতে ক-একজনের ক্ষেত্রে ধার করতেই হয়।
কাননগাঁও—	যে সময় খাজনা আদায় হয় সে সময় কদাচিৎ ফসল পাকে, ফলে চাষীরা দেনা করতে বাধ্য হয়।
নন্দগাঁও—	বৃষ্টির অবস্থা খারাপ হ'লে ফসল বাঁধা রেখেও খাজনা দিতে হয়।
ধোঁদ—	জমিতে উৎপন্ন ফসল বাঁধা রেখে খাজনা দেয়।
গিরিম —	নিজ নামে দেনা করে এবং যদি তা না মেলে তো ক্ষেতের ফসল কাটবার আগেই বিক্রী ক'রে খাজনা দিতে বাধ্য হয়।
শোনবাড়ী—	সঞ্চিত কিছু না থাকলে বা গরু বাছুর বিক্রী ক'রে টাকা না পেলে দেনা ক'রে দিতে হয়।
ওয়াধানা —	ক্ষেতের ফসল বাঁধা রেখে প্রথম কিস্তি দেয়— যদি ফসল না থাকে তো জমি মর্টগেজ রেখে বা বিক্রী ক'রে খাজনা দেয়।
মরগাঁও (আম্বি)—	ঐ অবস্থা।
টার্দৌলি—	ক্ষেতের ফসল বাঁধা রেখে দেয় এবং ফসল না থাকলে সুদে টাকা ধার ক'রে রাজস্ব দেয়।
কুশিগাঁও—	ঐ অবস্থা।

১৯০০ সালে ভ্যঘ্যান ন্যাশ—"ভীষণ দুর্ভিক্ষ" (The Great Famine—by Vaughan Nash—1900) নামে এক বই লেখেন। তাতে পূর্বোক্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকে সংক্ষেপে উপরের ঐ অনুসন্ধান-ফল প্রকাশ করেন। তিনি ঐ বইতে বলেছেন:

"বোম্বাই থাকার সময় আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে কর্তৃপক্ষ তাদের রাজস্ব আদায়ের জন্য মহাজনদেরই অত্যন্ত ভরসাস্থল ব'লে ধ'রে রেখেছেন।"

ভারতীয় সমাজে মহাজন ও ঋণ কিছু-একটা নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আওতায় এবং ধনতান্ত্রিক শোষণের আমলে মহাজনী প্রথার তাৎপর্য নতুন হয়েছে—তার রূপও অন্য রকম হয়েছে। আগে কৃষকেরা কেবল ব্যক্তিগত জামিনেই মহাজনের কাছ থেকে ঋণ করতে পারত এবং মহাজনী ব্যবসা সেকালে তত পাকাপোক্ত ছিল না;—কী হারে তাদের পাওনা নিষ্পত্তি হবে তার কিছু ঠিক ছিল না—গ্রামের সকলের বিচারে পরিমাণ নিষ্পন্ন হ'ত। সেকালের আইনে পাওনাদার দেনার বাবদে দেনদারের জমি ক্রোক করতে পারত না। বৃটিশ শাসনে এসব নিয়ম বদলে গেছে।

বৃটিশ আইনে দেনদারকে আটকানো এবং তার সম্পত্তি হস্তান্তরের অধিকার থাকাতে মহাজনের শিকারের চমৎকার ক্ষেত্র মিলে গেল;—তার পিছনে রক্ষী হিসাবে পুলিশ ও আইনের সমস্ত শক্তি খাড়া ক'রে দেওয়া হ'ল; এবং তাকে পুঁজিবাদী শোষণ-প্রথার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দাঁড় করানো হ'ল। কারণ মহাজন শুধু রাজস্ব আদায়ের কাজেই সাহায্য করে না;—সে ফসলের জন্য কৃষককে বীজ ধার দেয়, বা বীজের ব্যবসা করে। ফসল উৎপন্ন হওয়ার আগে থেকেই কিনে নেওয়ার মালিক সে একাই। কৃষকদের অধিকাংশ

লোকই দেনা-পাওনার হিসাব রাখতে পারে না। ফলে, তারা ক্রমান্বয়ে তার কাছে দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়ে;—আর, এই মহাজন হয়ে ওঠে গ্রামের হর্তাকর্তা বিধাতা। ক্রমে দেনার দায়ে কৃষকের জমি তার কাছে বাঁধা পড়ে বা বিক্রী হয়ে যায় এবং কৃষকেরা মজুরে পরিণত হয়; —নতুবা নিজের জমিতে খেটে মহাজনকে ফসলের ভাগ দিতে হয় এবং জমির খাজনা, দেনা ও দেনার সুদ একই সঙ্গে দিতে বাধ্য হয়। মহাজন ক্রমে ক্রমে গ্রামের ক্ষুদে পুঁজিদার হয়ে দাঁড়ায়— চাষীকে নিজের মজুর হিসাবে খাটাতে থাকে। কৃষকের রাগ এদেরই উপর আগে পড়ে। কারণ, তারা সাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকু বোঝে যে তাদের যত দুঃখের মূল হ'ল এই মহাজন সম্প্রদায়—এরাই হ'ল আসল অত্যাচারীর দল। তাই মাঝে মাঝে শোনা যায় যে এতকাল ধ'রে এত যন্ত্রণা সয়েও এতটা শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ প্রকৃতির ব'লে পরিচিত, ভারতের সেই চাষীরাই অনেক সময় মহাজনকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে! কিন্তু তারা শীঘ্রই বুঝতে পারে যে মহাজনই সব নয়—তার পিছনে রয়েছে অন্য এক বিরাট শক্তি—ইংরাজ শাসনের শক্তি। ভারতের ধনোৎপাদন করে বিরাট কৃষক সম্প্রদায়, ভোগ করে পুঁজিবাদী শোষণযন্ত্র; আর এই যন্ত্র ও কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝে এক অপরিহার্য কব্জার মতো সেঁটে রয়েছে মহাজন সম্প্রদায়। মহাজনের দ্বারা শোষণ যতই বাড়তে থাকে—ঐ পুঁজিবাদীযন্ত্র ততই তাড়াতাড়ি তার ব্যাপক শোষণের স্বার্থে মহাজনকে একটু

দাবিয়ে রাখতেও চেষ্টা করে। কারণ, যে হাঁসে সোনার ডিম পাড়ছে, তাকে মেরে ফেল্লে তো আর সোনার ডিম পাওয়া যাবে না! জমি দখল করা বা বেশি সুদ নেওয়া রোকবার জন্য গাদা গাদা আইন পাশ করা হয়েছে—কিন্তু সরকার থেকেই স্বীকার করা হয়েছে যে এই সব আইন ব্যর্থ হয়ে গেছে। (Agricultural Commission's Report on "Failure of Legislation,"— p. 436-7)। এমনি ক'রে, দেখা যাচ্ছে, অপ্রতিহত গতিতে কৃষকের দেনার পরিমাণ বেড়েই যাচ্ছে।

এম, এল ডার্লিং বৃটিশ শাসনে কৃষকের ঋণ বৃদ্ধি সম্পর্কে ভালো রকম অনুসন্ধান ক'রে খানকতক বই লিখেছেন। তাঁর লেখা 'The Punjab Peasant in Prosperity and Debt'—(1925), 'Rusticus Loquitur'—(1930) এবং 'Wisdom and Waste in a Punjab Village'—(1934) এই তিন খানি পুস্তকে তিনি অবশ্য সরকার পক্ষ টেনে কথা কইতে চেয়েছেন; কিন্তু তাঁর সংগৃহীত তথ্যগুলি অন্য কথা বলবে। পাঞ্জাবে বৃটিশ শাসনের পর থেকে কী ভাবে দেনা বেড়েছে তাই দেখাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ "শিখ শাসনে মর্টগেজের ব্যাপার কদাচিৎ ঘটত, কিন্তু বৃটিশ জয়ের পর থেকে এটা প্রত্যেক গ্রামেই দেখা যেতে লাগল; ১৮৭৮ সালের মধ্যে গোটা প্রদেশের শতকরা ৭ অংশই মর্টগেজে বাঁধা প'ড়ে গেল। ......১৮৮০ সালে কৃষক ও মহাজনের অ-সমদ্বন্দ্ব যুদ্ধে কৃষকরা সাংঘাতিক ভাবে হেরে গেল।......তারপর থেকে ত্রিশ

বৎসর পর্যন্ত মহাজন উন্নতির চরম শিখরে ওঠে এবং এত পরিমাণে সম্পদশীল হয়ে ওঠে যে ১৮৬৮ সালে, যে ব্যাঙ্কার ও মহাজনেরা (তাদের উপর নির্ভরশীল লোকজন নিয়ে) সংখ্যায় ৫৩,২৬৩ ছিল, তারা ১৯১১ সালে সংখ্যায় ১৯৩,৮৯০ হ'ল। (M. L. Darling , "The Punjab Peasant in Prosperity and Debt ", p. 208)

মিঃ ডার্লিং-এর মতে মহাজনেরা ১৯১১ সাল পর্যন্ত 'যতদূর পারে' ক'রে নিয়েছে। তাই তিনি ১৯২৭ সালে কৃষি-কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে আশার সঙ্গে বলেছিলেন : "পাঞ্জাবের গ্রাম্য মহাজনেরা দু'টী জেলা ছাড়া অন্য সব যায়গায় তাদের ব্যবসা ক্রমশ গুটিয়ে নিয়ে আসছে ; এর প্রধান কারণ হ'ল, সমবায় প্রথার সম্প্রসারণ, ঋণভারগ্রস্ত কৃষকের জন্য আইনের রক্ষাকবচ ও কৃষক-মহাজনের উৎপত্তি।" (রিপোর্ট, ৪৪২ পৃঃ)।— কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ডার্লিং তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক 'Rusticus Loquitur' (১৯৩০ সালে প্রকাশিত) লেখার সময়েই অত্যন্ত মামুলি ধরণের আশার কথা ব'লেও বিপদসূচক সতর্কধ্বনি তুলেছেন : "জমি হস্তান্তর আইন (Land Alienation Act) পাশ হওয়া সত্ত্বেও কৃষকের উপর আবার ব্যাপক আকারে শোষণ শুরু হওয়ার আশঙ্কা আছে।—এই সম্ভাবনার লক্ষণ পশ্চিম-পাঞ্জাবে ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে ; এই অঞ্চলের বড় জমিদাররা এই আইনের সুযোগে কৃষকদের সর্বনাশ ক'রে নিজেদের জমি বাড়িয়ে নিচ্ছে।" (৩২৬ পৃঃ)

১৯৩৫ সালেই পাঞ্জাবের রেভেনিউ-কর্তৃপক্ষরা তাঁদের রিপোর্টের ৬ পৃষ্ঠায় জানাচ্ছেন ঃ "গ্রামাঞ্চলে কৃষক-মহাজনেরা বেশ প্রবল হয়ে উঠছে।" ১৯১৯ সালের অনুসন্ধানে মিঃ ডার্লিং দেখেছিলেন যে কৃষক-ভূম্যধিকারীর শতকরা ১৭ জন মাত্র দেনা-শূন্য; আর দেনদারদের দেনার পরিমাণ গড়পড়তা ৪৬৩্ টাকা ;—অর্থাৎ দেনা তাদের জমির খাজনার বারোগুণ!

ফরিদপুর জেলার লোকের ঋণ-বৃদ্ধি সম্পর্কে একটা জাজ্বল্যমান বিবরণ মিঃ জ্যাকের (বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি) ১৯০৬ সালের অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে। মিঃ জ্যাকের 'Economic Life in a Bengali District' নামক পুস্তকে লেখা আছে যে ঐ সময় ফরিদপুর জেলার শতকরা ৫৫টী পরিবার ঋণমুক্ত ও বাকী ৪৫টী পরিবার ঋণগ্রস্ত। তারপর ২৫ বছর পরে ১৯৩৩-৩৪ সালে, বেঙ্গল বোর্ড অব ইকনমিক এনক্যোয়ারী ঠিক ঐ গ্রামেই অনুসন্ধান ক'রে জানিয়েছেন, ঐ সময়ে ফরিদপুর জেলার শতকরা মাত্র ১৬টী পরিবার ঋণমুক্ত ; আর শতকরা ৮৪টী পরিবারই ঋণে ডুবে আছে।

কৃষকের ঘাড়ে তিন রকমের বোঝা

আজকের দিনেও যে-সকল কৃষক ভূমিহীন সর্বহারা পর্যায়ভুক্ত হয়নি, তাদের ঘাড়ে তিন রকমের বোঝা চেপে রয়েছে। এই সকল কৃষকের অনেকেরই হাতে চাষ-বাসের যথেষ্ট সরঞ্জাম নেই ; জমি হয়তো অনেকের এতই অল্প এবং

সঙ্কীর্ণ যে, সেইটুকু জমির আয়ে তাদের সপরিবারে জীবন যাত্রার সর্বনিম্ন চাহিদাও মেটেনা। তবু সেই সামান্য আয়টুকু. চিলের মতো ছোঁ মেরে নেওয়ার জন্য তিন-তিনজন ভাগীদার লুব্ধ দৃষ্টি মেলে রয়েছে।

সরকারের তরফ থেকে সোজাসুজি রাজস্বের দাবী তো আছেই, তার উপরে আবার ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে নানা ভাবের আদায় চলেছে। কৃষকের ঐ সামান্য আয়টুকু থেকে লবণ, কেরোসিন, দেশলাই ও আবগারী জিনিষের শুল্ক বাবদে আরো অনেক টাকা সরকারের তহবিলে তুলে দিতে হয়। শুল্ক বসানো যায় এই রকম নিত্যব্যবহার্য অন্য কোনো জিনিষ না পাওয়ায় সাইমন রিপোর্টে যে আক্ষেপ করা হয়েছে, তা উপভোগ্য: "ভারতের গ্রামগুলি এতই আত্ম-নির্ভরশীল যে লবণ, কেরোসিন, ও সুরা জাতীয় জিনিষ ছাড়া আর-কিছু বাইরে থেকে তাদের আনতে হয় না। ফলে, ঐ ক'টী জিনিষ ছাড়া সরকার শুল্ক বসাবার অন্য কোনো উপায় পায় না। তাই যদি হয়, তাহ'লে এক লবণের উপরেই যে শুল্ক আদায় হচ্ছে, ১৯৩৬-৩৭ সালে তার হিসাব হ'ল, ৬৬ লাখ পাউণ্ড—অর্থাৎ সমস্ত রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ। —অথচ এই লবণ হ'ল অতি দীন-দরিদ্রের নিত্য-ব্যবহারের অতি তুচ্ছ সামগ্রী।

আর এক বোঝা হ'ল—জমিদারের খাজনা। এই বোঝা ভারতের অধিকাংশ কৃষককেই বইতে হয়। কারণ, বৃটিশ

ভারতের অর্ধেক জমিই জমিদারী প্রথার অন্তর্গত, এবং যে সকল যায়গায় রায়তওয়ারী প্রথা আছে সেখানে ১/৩ জমিই হাত-ফেরতা হয়ে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে চ'লে গেছে।

এর পরের বোঝা হ'ল—মহাজনের সুদের দাবী। এই বোঝা যে কৃষকদের কত লোকের বইতে হয় তার আর ইয়ত্তা নেই। মিঃ ডালিং-এর পূর্বোক্ত হিসাব ও ফরিদপুরের উদাহরণ যদি গ্রাহ্য করা হয়, তাহ'লে বলতে হয় যে কৃষকদের পাঁচ ভাগের চার ভাগই এই বোঝার চাপে নিষ্পেষিত।

কৃষকদের কাছ থেকে কত আদায় করা হয় এবং কতটুকু তার জীবন ধারণের জন্য বাকী থাকে ?—ভারতীয় কৃষি-সমস্যার এই মূল প্রশ্ন সম্পর্কে কোনো উত্তর আজও পর্যন্ত সরকারী নথি-পত্র থেকে মেলে না। সরকারী রাজস্ব ছাড়াও খাজনা বাবদে জমিদারী ও মধ্যস্বত্বভোগীদিগকে কত পরিমাণ টাকা দিতে হয়, তা তো আজ পর্যন্ত জানবার চেষ্টাই হয়নি; এমনকি, দেনার সুদও যে কী পরিমাণে দেওয়া হয় তাও জানবার কোনো ব্যবস্থাই নেই। এই সব বিষয়ে সঠিক খবর না থাকায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনক্যোয়ারী কমিটির মাইনরিটী রিপোর্ট একটা মোটামুটি হিসাব করেছে—(পৃঃ ৩৬৭)। —৩৫ কোটী টাকা হ'ল রাজস্ব; তার উপর ভিত্তি ক'রে এঁরা হিসাব করেছেন যে দেনার সুদ অত্যন্ত কম ক'রে ধরলেও রাজস্বের তিনগুণ—অর্থাৎ ১০০ কোটি টাকা হবে; এবং রাজস্বের সঙ্গে জমিদারের প্রাপ্য হবে রাজস্বের দেড় গুণ।

তাহ'লে এই বোঝার মোট পরিমাণ হ'ল রাজস্বের পাঁচ গুণ। ঐ রিপোর্টের মতে এই হিসাবটা নাকি খুব কম ক'রে ধ'রেই করা হয়েছে। জমিদার ও সরকারের নীচে যেসব মধ্যস্বত্ব-ভোগীরা আছে, তারা খাজনার নামে যা আদায় করে তার পরিমাণ রাজস্বের মাত্র দেড় গুণ ব'লে ধরলে, তা অত্যন্ত কম ক'রেই ধরা হয়েছে বলতে হবে। মাদ্রাজে একটা বিল আইনে পরিণত করবার জন্য এই হিসাব ধরা হয়েছিল; তাতে বলা হয়েছিল, মোট খাজনার পরিমাণ যেন ঐ দেড় গুণের বেশি না হয়। ঐ বিল অবশ্য আইনে পরিণত হয়নি। বাংলা দেশে তো কৃষকেরা জমিদার সম্প্রদায়কে রাজস্বের চেয়ে ৫-৬ গুণ বেশিই দিয়ে থাকে এবং অন্যান্য প্রদেশেও এর কম দিলে চলে না। পূর্বোক্ত রিপোর্টেও স্বীকার করা হয়েছে যে জমিদারকে যা দিতে হয় তা রাজস্বের দেড় গুণের চেয়ে অনেক বেশি।

এই রকম কমিয়ে হিসাব ক'রেই দেনার সুদও রাজস্বের তিনগুণ ধরা হয়েছে। ৯০০ কোটী টাকার সুদ ধরা হয়েছে ১০০ কোটী টাকা,—অর্থাৎ সুদ শতকরা ১১৲ টাকা। কিন্তু দেখা যায়, গ্রামের মহাজনেরা সচরাচর টাকায় প্রতি মাসে এক আনা বা ছ'পয়সা সুদ ধ'রে নেয়—অর্থাৎ বাৎসরিক সুদের হার দাঁড়ায় শতকরা ৭৫৲ টাকা। সুতরাং পূর্বে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা কৃষকের প্রকৃত বোঝার চেয়ে অনেক বেশি। এর উপর আবার যদি লবণ-করের ব্যয়টা ঐ হিসাবের সঙ্গে

যোগ ক'রে দেওয়া যায় তাহ'লে বোঝাটা দাঁড়ায় বাৎসরিক ২০০ কোটী টাকা ;—অর্থাৎ প্রতিটী কৃষককে বৎসরে কুড়ি টাকা ক'রে দিতে হয়। অথচ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটীর সংখ্যাধিক্যদের রিপোর্টে আছে : "বৃটিশ ভারতের সাধারণ কৃষকের মাথা-পিছু গড়পড়তা আয় বছরে ৪২৲ টাকার বেশি হয় না।" (৩৯ পৃঃ)

কৃষক শোষণের এর থেকেও ভয়াবহ চিত্র নিখুঁতভাবে এঁকেছেন এন, এস, সুব্রামানিয়া তাঁর "দাক্ষিণাত্যের একটী গ্রামের চিত্র" নামক পুস্তকে। ('Studies of a South Indian Village' by N. S. Subramanian—Congress Political and Economic Studies No. 2) গ্রামটী হ'ল ত্রিচিনপল্লী জেলার নেরুর। সেখানকার জনসংখ্যা ৬২০০। ঐ গ্রামের লোকের সর্বপ্রকার আয় ব্যয় ও উদ্‌বৃত্তের হিসাব দেখানোর একটা খুব সুবিধা রয়েছে। কারণ, সেখানকার জমিগুলির মালিক এবং মহাজনরা সকলেই ভিন্ন গ্রামের লোক ; ফলে, খাজনা ও সুদ সোজাসুজি অন্য যায়গায় বেরিয়ে যাচ্ছে। অনুসন্ধানে দেখা গেল, ঐ গ্রামের উৎপন্ন সব রকম কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাজার দর হিসাবে পাওয়া যায় ৩৪৪,০০০৲ টাকা। চাষ-বাসের খরচ-খরচা বাদে মোট আয় হ'ল ২১২,০০০৲ টাকা। (গ্রামের লোকের যে মজুরী দেওয়া হয়েছে তা এই হিসাবে ধরা নেই।) কৃষি ছাড়া অন্য বাবদে, যেমন গ্রামের বাইরে মজুরী খেটে, সরকারী চাকুরী বা পেন্‌সন্‌ থেকে এবং তেজারতি মহাজনীর

সুদের কারবারে আয় হ'ল ২৪,০০০৲ টাকা। তাহ'লে গ্রামের মোট আয় হচ্ছে, (২১২,০০০+২৪,০০০) ২৩৬,০০০৲ টাকা।

এইবার ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে রাজস্ব, জলকর বা অন্যান্য সেস্ বাবদ দিতে হয় ৩০,০০০৲ টাকা; ভিন্‌গ্রামের জমিদারদের যে খাজনা দেওয়া হয়—তার পরিমাণ ৭০,০০০৲ টাকা; নিম্নপক্ষে শতকরা ৮৲ টাকা হিসাবে ঋণের সুদ বাবদ ৪০,০০০৲ টাকা; তাড়ি ও অন্যান্য আবগারী জিনিষের জন্য সরকারী ট্যাক্স, গাছ-কর, গাছের মালিকদের দেওয়া নজরানা প্রভৃতি নিয়ে ১২,০০০৲ টাকা। এই সব হ'ল মোট ১৫২,০০০৲ টাকা; আর এ ছাড়া অন্যান্য খরচ বাবদ ৪,০০০৲ টাকা এই সঙ্গে ধ'রে ঐ গ্রামের সমস্ত খরচ হয় ১৫৬,০০০৲ টাকা। এখন আয় থেকে ব্যয় বাদ দিলে মাত্র ৮০,০০০৲ টাকা থাকে—অর্থাৎ মাথাপিছু মোটে ১৩টী টাকা থাকে।

এই হিসাবে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে গ্রামের প্রতিটী লোক বছরে ৩৮৲ টাকা রোজগার করে; কিন্তু তশিলদার, সরকার, মহাজন, জমিদারকে দিয়ে-থুয়ে তার সারা বছরের খরচের জন্য থাকে মাত্র ঐ ১৩টী টাকা। তার আয়ের তিন ভাগের দুই ভাগ কেড়ে নিয়ে তাকে দেওয়া হয় মাত্র এক ভাগ।

এমনিতর শতসহস্র টুকরো টুকরো নজিরের ভিতর দিয়ে সারা ভারতের কৃষক-দুর্দশার যে ভয়াবহ স্বরূপ দেখা যাচ্ছে তা অন্ধের চোখও অস্বীকার করতে পারে না। দেশের সমগ্র কাঠামোর ভিত্তিমূলে এই কৃষি-সমস্যা এতদিন ধ'রে যে বিরাট

ফোঁকর তৈরী করছে তাতে সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির সকল ব্যবস্থাই একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কোনো জোড়াতালিই তখন আর সেই অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্যকে রোধ করতে পারবে না।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে ফরাসী চাষীদের দুর্দশা সম্বন্ধে কার্লাইল বলেছিলেন—"বিধবার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েও জমিদার সন্তুষ্ট হতে পারে নি। খাজনা ও আইনের নাগপাশে তাকে বেঁধে ফেলেছে।"

সেদিন ফরাসী দেশের চাষীদের উপর সেই নিষ্ঠুর নিষ্পেষনের বিরুদ্ধে ঘনিয়ে এসেছিল ফরাসী বিপ্লব। আর আজ ভারতের চাষীদের অবস্থা তার চাইতেও শত গুণ সঙ্গীন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কৃষি-বিপ্লবের পথে

এই কৃষি-সঙ্কটের প্রত্যেকটী কারণ ও প্রত্যেক অবস্থা সমগ্র বৃটিশ শাসনের প্রশ্রয়ে ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে এবং আজ তা একেবারে চরমে পৌঁছেছে। আমরা এতক্ষণ যে বিচার বিশ্লেষণ করলাম তা থেকে কৃষি-সঙ্কটের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি সংক্ষেপে দেখা যেতে পারে।

কৃষিসঙ্কটের উদ্ভব

প্রথমত, জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে কৃষি-কার্যের মধ্যে অ-ব্যবস্থা ও বে-হিসাব বেড়েই চলেছে। একদিকে কৃষি-কার্যে লোকের ভিড় বাড়ছে, অন্যদিকে উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে আসছে। এর উপর, দেশীয় শিল্পের ধ্বংসসাধন তো চলেইছে। (ইংলণ্ডের উপনিবেশ হিসাবে ভারতবর্ষ নিজের কাঁচা মাল ইংলণ্ডকে সরবরাহ করতে ও ইংলণ্ডের শিল্পজাত মাল ক্রয় করতে বাধ্য থাকার দরুণ এটা হবেই) ভারতের দুঃখ-দুর্দশার অন্য সব কারণগুলোর উৎস এই খানেই।

দ্বিতীয়ত, কৃষিকার্যের যত অধোগতি হচ্ছে, উন্নতির পথ ততই বন্ধ হয়ে পড়ছে; ফসলের ফলন ক'মে আসছে, শ্রম-শক্তির অযথা অপব্যয় বাড়ছে, চাষের জমিগুলোতে আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না, যেটুকু আবাদী জমি রয়েছে তারও কোনো উন্নতি সাধন করা যাচ্ছে না; যেটুকু বা ফসল হচ্ছে—তাও নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয়ে পড়ছে ও জমি ক্রমেই পতিত পড়ছে এবং উঠিত জমি ক্রমেই ক'মে আসছে।

তৃতীয়ত, জমির চাহিদা কৃষকদের কাছে ক্রমেই বেড়ে চলেছে; প্রত্যেক দাগ ক্ষেতের আয়তন ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে, শত ভাগে বিভক্ত হয়ে টুকরো টুকরো ক্ষেতের সংখ্যা ছড়িয়ে পড়ছে; ছোট ছোট জমির ফালি, যা চাষ করার পক্ষে নিতান্তই লোকসানজনক, তার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আজ অধিকাংশ জমিই এই লোকসানি ফালিতে পরিণত হয়েছে।

চতুর্থত, জমিদারী প্রথা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে নানারকম স্বত্ব-উপস্বত্বের সৃষ্টি হচ্ছে এবং নিষ্কর্মা অ-চাষী বিত্তভোগীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ও এই সমস্ত অ-চাষীদের কাছে জমির হস্তান্তরও বেড়ে যাচ্ছে।

পঞ্চমত, যে সকল চাষীর হাতে এখনও জমি আছে তাদের দেনার বোঝা অসম্ভব রকমে বেড়ে যাচ্ছে।

ষষ্ঠত, দেনা যত বাড়ছে, জমি-জমা ততই মহাজন ও ঐ শ্রেণীর লোকের হাতে চ'লে যাচ্ছে। ফলে, জমিদারী প্রসারের সঙ্গে জমিহীন কৃষক বা গ্রাম্য সর্বহারার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

সপ্তমত, গ্রাম্য সর্বহারা দলের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে ১৯২১ সাল থেকে ’৩১ সালের মধ্যে এরা সমস্ত কৃষকের ১/৫ অংশ থেকে ১/৩ অংশে পরিণত হয়েছে এবং শীঘ্রই অর্ধেকে পরিণত হবে ব’লে মনে হচ্ছে।

দেনার পরিমাণ বাড়লে কৃষকেরও যে সর্বস্বান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে—এ ঘটনাটা সর্ববাদীসম্মত। ১৮৯২ সালেই যে কমিশন দাক্ষিণাত্যের কৃষকদের দুঃখ উপশম সংক্রান্ত আইনের কার্যকারিতা অনুসন্ধান করতে বেরিয়েছিল, তারা অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে স্বীকার করেছে ঃ “জমির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই অথচ শোষণের কায়দায় ওস্তাদ—এই রকম শ্রেণীর লোকরাই আজ জমির মালিক হয়ে দাঁড়িয়েছে ; জমির উন্নতির জন্য কোনো চেষ্টাই এরা করে না। দায়িত্বজ্ঞানহীন জমিদারদের ক্ষমতা পরিচালনার পক্ষে এই নতুন মধ্যস্বত্বভোগীরা সম্ভবত জগতের মধ্যে সব চেয়ে অনুপযুক্ত শ্রেণী। এদের স্বভাব হ’ল—লুটপাট ক’রে নেওয়া ; তাই এরা জমিদার হিসাবে চাষীর কাছ থেকে যত বেশি হারে আদায় করা সম্ভব ততটা আদায় ক’রে নেয়। এরাই আবার চাষীদের মহাজন হয়ে বসেছে ; তাই অনেক সময় দেখা যায় যে চাষীরা এদের বিনা মাইনার গোলামে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে।”

১৯২৮ সালে কৃষি-কমিশন স্বীকার করেছে ঃ “কৃষকেরা যে দেনা না ক’রে পারেই না—এই ঘটনা মহাজনকে প্রবল শক্তিশালী ক’রে তুলেছে। জমির অধিকাংশই যে আস্তে আস্তে

মহাজনের হাতে চ'লে আসবে—এ যেন বিধাতার আইন! এবং এই কারণে মহাজনের সার্বভৌম ক্ষমতা অবিসম্বাদী।" ৪৩৫ পৃঃ।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, সরকারী কৃষি-কমিশন মহাজনদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করলেও তারা এই মস্ত কথাটাই এড়িয়ে গেছেন যে, মহাজনরা সরকারী আইনের জোরেই এই শোষণ-ক্ষমতা লাভ করেছে; যে-আইনের তাড়ায় রাজস্ব ও জমিদারের খাজনার দায়ে চাষীরা মহাজনের কবলে পড়তে বাধ্য হয়, সেই আইনের জোরেই তাদের জমি মহাজনের হাতে হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

১৯৩১ সালে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনক্যোয়ারী কমিটী স্বীকার করেছেঃ "ঋনের দায়ে চাষীর হাত থেকে জমি বেরিয়ে অ-চাষী মহাজনদের হাতে চ'লে যাচ্ছে, সেইজন্য দুর্দশাগ্রস্ত ভূমিহীন সর্বহারা দলের উদ্ভব হচ্ছে। ফলে, কৃষি-কার্যে নৈপুন্য হ্রাস পাচ্ছে। কারণ, মহাজনেরা অধিকতর উচ্চহারে জমি বিলি করায় চাষীরা সেই জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করতে পারে না।" (৫৯ পৃঃ)

১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টও বলেঃ সম্ভবত জমির মালিকানা অ-চাষী লোকেদের হাতেই বেশি চ'লে যাচ্ছে। (Census of India, 1931, vol I. part 1, p. 288)

কয়েক বৎসর ধ'রে জগৎ-জোড়া অর্থনৈতিক সঙ্কট ও তার ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হওয়ায় কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অবনতি হয়েছে। কৃষকের সর্বস্বান্ত

হওয়ার প্রক্রিয়া এবং তাদের মধ্যেকার শ্রেণী-বিভাগ তীব্রতর ও দ্রুততর হয়ে উঠছে।

কৃষিজাত দ্রব্যের দাম-যে কী সাঙ্ঘাতিক কমেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত খবরাখবর ও তথ্য সংগ্রহকারী বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেলের প্রকাশিত সংখ্যা থেকে। ১৯২৮-২৯ সালে—অর্থাৎ মন্দার বাজার শুরু হওয়ার ঠিক পূর্বেই—কৃষিজাত দ্রব্যের অর্থমূল্য সাধারণ দরের হিসাবে প্রায় ১০৩৪ কোটী টাকা ছিল। ১৯৩৩-৩৪ সালে এটা ক'মে গিয়ে হ'ল ৪৭৩ কোটী টাকা—অর্থাৎ শতকরা ৫৫ ভাগ ক'মে গেল। যারা আগেই দারিদ্র্যের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে, সেই সব কৃষকের আয় হঠাৎ যদি অর্ধেক ক'মে যায় অথচ ব্যয় সেই পরিমাণে না কমে, তাহ'লে তাদের অবস্থা-যে কী সাঙ্ঘাতিক হতে পারে তা বোধ করি বেশি ক'রে বলার প্রয়োজন হবেনা। ব্যয় কমা তো দূরের কথা বরং দেখা গেল, ১৯২৮-২৯ সালে যে-রাজস্বের পরিমাণ ৩৩ কোটী ১০ লক্ষ টাকা ছিল, তাকে ১৯৩১-৩২ সালের মতো মন্দার বাজারেও প্রায় একই পরিমাণে (৩৩ কোটী) বজায় রাখা হয়েছিল। ১৯৩৩-৩৪ সালে রাজস্ব যে শতকরা ৯ ভাগ ক'মে (৩০ কোটী টাকা) গিয়েছিল, তার কারণ হ'ল, কৃষকের চূড়ান্ত অক্ষমতা ও অনেক ক্ষেত্রে জমি ইস্তফা দেওয়া।

বাংলার চাষীর দুরবস্থা-যে কতখানি অসহনীয় হয়েছে তার খবর মেলে বাংলার পাট এনকোয়্যারী কমিটির ১৯৩৪

সালের রিপোর্টে। ১৯২০-২১ ও ১৯৩২-৩৩ সালে, কৃষকের ক্রয়-ক্ষমতার তুলনামূলক হিসাব এই কমিটী করেছেন। তাতে প্রকাশ পেয়েছে, ১৯২০-২১ থেকে ১৯২৯-৩০ সালে বাংলায় বিক্রীর উপযুক্ত সমস্ত ফসলের বাৎসরিক মোট দাম ছিল ৭২ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা; ১৯৩২-৩৩ সালে তাই ক'মে গিয়ে দাঁড়াল, ৩২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকায়। অথচ কৃষকের আবশ্যকীয় খরচ দাঁড়িয়েছে, ২৭ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা থেকে ২৮ কোটী ৩০ লক্ষ টাকায়। তাহ'লে দেখা গেল যে কৃষকের "স্বাধীন ক্রয়-ক্ষমতা" ৪৪ কোটী ৫০ লক্ষ থেকে ৪ কোটী ৪০ লক্ষ টাকায় ক'মে এসেছে। এই সময়ে কলকাতার বাজার দর ২২৩ থেকে ১২৫ টাকায় ক'মে এসেছে—অর্থাৎ শতকরা ৪৪ ভাগ কমেছে;—সে ক্ষেত্রে "স্বাধীন ক্রয়-ক্ষমতা" শতকরা ৯০ ভাগ ক'মে গেছে।

ঠিক এই সময়টাতে এদেশের চিরকেলে সঞ্চয়—অর্থাৎ সোনার গহনা-পত্র কৃষক-সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আদায় ক'রে সরকারী দেউলিয়াত্ব রোধ করা হয়েছিল। কারণ, ভারতের রপ্তানী-দ্রব্যের দাম এত ক'মে গিয়েছিল যে তা দিয়ে বৃটিশের বাৎসরিক পাওনা মেটানো সম্ভব হ'তনা। ১৯৩১ থেকে '৩৭ সালের মধ্যে কমপক্ষে অন্তত ২৪ কোটী ১০ লাখ পাউণ্ড সোনা ভারত থেকে চালান দেওয়া হয়। কিন্তু এমন ক'রে আর কতদিন চলতে পারে?—সোনা তো আর চাষীর ঘরে তৈরী হয় না!

যুক্ত-প্রদেশে খাজনা দিতে না পেরে যে-সকল কৃষক জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, ১৯৩১ সালে তাদের সংখ্যা ছিল ৭১,৪৩০ ; রাজস্ব জোর ক'রে আদায় করার জন্য সরকারী হুকুমের সংখ্যা ছিল ২৫৬,২৮৪। আমরা আগেই একবার বলেছি যে বাংলায় ১৯৩০ সালে পূর্ত বিভাগেয় কমিটী স্বীকার করেছে, "জমি পতিত হয়ে যাচ্ছে।"

১৯৩৪-৩৫ সালে সরকারী হিসাবে দেখা গেল যে ১৯৩৩-৩৪ সালে মোট ২৩ কোটী ৩২ লাখ একর জমিতে চাষ করা হয়—তা ১৯৩৪-৩৫ সালে ২২ কোটী ৬৯ লাখ একরে গিয়ে দাঁড়াল—অর্থাৎ এক বছরে ৫২ লাখ ৬৬ হাজার একর জমি ক'মে গেল। যেসব জমিতে খাদ্য ফসল উৎপন্ন করার জন্য আবাদ করা হ'ত—তার ৫,৫৮৯,০০০ একর ক'মে গেল। ১৯৩৪ সালের পর কৃষিজাত দ্রব্যের দর অল্প বৃদ্ধি পেলেও কৃষকের দুঃখের ভার কিছুমাত্র লাঘব হয় নি। এ্যান্‌ষ্টে স্বীকার করছেন : "১৯৩৪ সাল থেকে কৃষকদের দুর্দশা আরো বেড়ে গেছে ব'লে মনে হচ্ছে—" ("Economic Development of India", 488 xxvii) কৃষকের আয় অর্ধেক হয়ে যাওয়ার অর্থ হ'ল—তার দেনার পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়া এবং হয়েছেও তাই ; ১৯৩১ সালে তাদের মোট দেনার পরিমাণ যা ছিল, আজ তা দ্বিগুণ হয়েছে। ১৯২১ সালে কৃষকের দেনা ছিল ৪০০ মিলিয়ান পাউণ্ড (M, L. Darling, "The Punjab Peasant in Prosperity and Debt") ১৯৩১ সালে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনক্যোয়ারী

কমিটীর রিপোর্টে জানা যায় যে এটা বেড়ে ৯০০ কোটী টাকা বা ৬৭-১/২ কোটী পাউণ্ড হয়েছে। ১৯৩৭ সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি-ঋণ বিভাগের প্রথম রিপোর্টেই প্রকাশ পায় যে ঋণ বর্তমানে মোট ১৮০০ কোটী টাকা বা ১৩৫ কোটী পাউণ্ড হয়েছে। তাহ'লে ৪০ কোটী থেকে ৬৭-১/২ কোটী পাউণ্ড ঋণ বাড়ল দশবছরের মধ্যে এবং ছ'বছরে ৬৭-১/২ কোটী থেকে বেড়ে হ'ল ১৩৫ কোটী পাউণ্ড। এই সরকারী সংখ্যাগুলি থেকে কৃষি-সঙ্কটের যে তীব্রতা ও গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে তা বেশি ক'রে বলার দরকার করে না।

কৃষি-বিপ্লবের অনিবার্যতা

আজ ভারতের কৃষক যে-অবস্থার সামনে দাঁড়িয়েছে— তার থেকে নিষ্কৃতি তাকে খুঁজে পেতেই হবে। বর্তমান অবস্থা, বর্তমান ভূমি-প্রথা ও সাম্রাজ্যবাদের এই বনিয়াদের উপর এই নিষ্কৃতির পথ কি মিলবে? আজকের দিনে এটা বেশ বোঝা যায় এবং সকলে স্বীকারও করেন যে একটা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দরকার—যার ফলে ভূমির স্বত্ব ও ভূমি-বণ্টন সম্পর্কিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষ-বাসের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবেশ লাভ করে। আজই হোক আর কালই হোক, জমিদারী প্রথাকে লোপ করতেই হবে। আমরা দেখেছি যে ভারতে

জমিদারী প্রথা ভারতের নয়—পশ্চিমের নকল মাত্র। তাই লোকের মনেও তার জন্য মোটেই দরদ নেই। তাছাড়া এদেশের জমিদারী প্রথার কোনো সামাজিক প্রয়োজনই নেই। এদেশের জমিদার-শ্রেণীর মতো নিষ্কর্মা শ্রেণী দুনিয়ায় আর নেই। জমির মঙ্গল তো দূরের কথা, মানুষের জন্যও এদের কোনো দরদ নেই; এরা পারে সুধু ক্ষমতার অপব্যবহার করতে, কৃষকের সর্বনাশ করতে এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বিষাক্ত ক'রে তুলতে। কৃষকেরা এই পরগাছা সম্প্রদায় কিছুতেই সহ্য করতে পারে না বা এই পরগাছাকে পালন করার মতো সামর্থ্যও তাদের আর নেই। কৃষক যা'ই উৎপন্ন করুক—আজকের দিনে তা দিয়ে তার প্রথম প্রয়োজন হবে তার নিজের জীবনযাত্রাকে স্বচ্ছল ক'রে তোলা, তারপর সামাজিক প্রয়োজন মেটানো এবং শেষে কৃষিকার্যের উন্নতি করা। এখানে জমিদারী প্রথা বাঁচিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজনই নেই।

পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা ও মহাজনী প্রথা সম্পর্কেও এই কথা খাটে। অনতিবিলম্বে সুদসমেত দেনা মাফ ক'রে দিতে হবে এবং সুদের হার রীতিমতো ভাবে কম ক'রে দিতে হবে। সুধু এই করলেই চলবেনা, এতে সামান্য উপশম হতে পারে মাত্র।—দেনার মূল কারণ তুলে দিয়ে মহাজনের পরিবর্তে এমন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে হবে, যার ফলে প্রথমত কৃষকের উপর অযথা দাবী বন্ধ হয়, জমিগুলি চাষোপযোগী করা যায় এবং

দ্বিতীয়ত, কৃষকের ঋণ পাওয়ার এমন একটা যায়গা থাকা উচিত যেখান থেকে অত্যন্ত অল্প সুদে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমষ্টিগত দায়িত্বে কৃষকেরা সহজে ঋণ পেতে পারে।

খাজনার হার কম ক'রে দেওয়া বা মাফ করা, ঋণ বা সুদ মকুব করা প্রভৃতি উপায় অবিলম্বেই হতে পারে ;—কিন্তু কৃষকের দারিদ্র্যের মূল কারণ উঠিয়ে দিতে হ'লে ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবেই। প্রায় ত্রিশ লক্ষ তো ক্ষুধে জমিদার রয়েছে—যারা জমিদার হয়েও অত্যন্ত গরীব ; এদের সম্পত্তির আয় সহরের অনেক ছোট-খাটো চাকুরে বাবুদের বুড়ো বয়সের পেনসনের সমান। কিন্তু এদেরই অস্তিত্ব জমিদারী প্রথাকে আরও গোলমেলে ক'রে তুলেছে। এইসব কারণে খাজনা কমিয়ে দিতে হ'লে সরকারী রাজস্বে যে ঘাটতি হবে তা পূরণ করার প্রধান ভারটা বড় বড় জমিদারের ঘাড়ে চাপাতে হবে। এই অনুসারে কেউ কেউ বলেন যে কৃষির আয়ের পরিমাণ বুঝে, অর্থাৎ—যাদের বেশি আয় তাদের উপর বেশি ইনকাম-ট্যাক্স বসিয়ে, বড় বড় জমিদারদের ঘাড়ে অনেক-খানি চাপিয়ে, কৃষকদের দুঃখ কিছুটা উপশম করা যায়। (কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ইনকাম-ট্যাক্সটা কৃষিজাত দ্রব্যের আয়ের উপর ধার্য হয় না, সুতরাং জমিদার রেহাই পেয়ে যায়—ফলে ইন্‌কাম-ট্যাক্সের দাবী শিল্প-ব্যবসাকে বইতে হয়)। —পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে অবশ্য সরকারের হাতে অনেক টাকাই জমে ; এবং সরকার ইচ্ছা করলে এই টাকা কৃষিকার্যের উন্নতির

জন্য ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এতেও কৃষকদের অবস্থার আশু উপশম হবে না যদি খাজনার হার ও সেই অনুপাতে রাজস্বের পরিমাণ না কমানো যায়। এর থেকেও বেশি-কিছু করতে হ'লে জমিদারী প্রথাকে একদম বদলিয়ে দিতে হবে; এবং তার ফলে যারা জমির আয় থেকে বিচ্যুত হবে তাদের জন্য অন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। —এই কারণে কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতি ও শিল্প-ব্যবসার উন্নতি একই সঙ্গে করা প্রয়োজন।

তাহ'লে মূল সমস্যা সুধু জমিদারী প্রথা নয়—সমগ্র ভূমি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নতুন ক'রে তৈরী করা ও নতুন ভাবে জমি বিলি-ব্যবস্থা করা। এই বিলি-ব্যবস্থা ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হ'লে কতকগুলি লোকের ব্যক্তিগত কায়েমী স্বার্থের প্যাঁচালো ব্যবস্থাকে ভারতের অগণিত জনসাধারণের সুখ-সুবিধার জন্য ধ্বংস ক'রে দিতে হবে। বিদেশী সরকারের আমলা-তন্ত্রের কাছ থেকে এ ঘটনা আশা করা যায় না—কারণ পূর্বেই বলেছি, এই সরকারের মূল আশ্রয় ঐ অল্পলোকের কায়েমী স্বার্থের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কৃষকদের নিজেদের প্রেরণা ও সংগ্রামে এবং যে শাসন-ব্যবস্থা কৃষকের স্বার্থ নিয়ে লড়বে সেই শাসন-ব্যবস্থার নেতৃত্বে এ কার্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভব।

অবশ্য, জমির বিলি-ব্যবস্থা সমস্ত কৃষি-কার্যকে নতুন ভাবে গ'ড়ে তোলার প্রাথমিক সোপান মাত্র। কারণ, এটা হওয়ার পরই কৃষি-কার্যে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ ও যন্ত্রপাতির

প্রচলন করতে হবে এবং পতিত জমিকে উদ্ধার ক'রে কাজে লাগাতে হবে। এই প্রসঙ্গে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এনক্যোয়ারী কমিটীর রিপোর্টের একটা যায়গা স্মরণ করা যেতে পারে (Enclosure XIII, p. 700)। এখানে বলা হয়েছে, ভারতের প্রতি-একর জমির ফসল-উৎপাদনের হার যদি ইংলণ্ডের সমান হয়—তাহ'লে অবিলম্বে বছরে ১০০ কোটী পাউণ্ডের সম্পদ বেড়ে যাবে ; এবং যদি, ডেন দেশের গম উৎপাদনের সমান হয় তাহ'লে ১৫০ কোটী পাউণ্ড বছরে বাড়তি সম্পদ হবে—অর্থাৎ ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতের উৎপন্ন সমস্ত ফসলের মোট দামের ৫ গুণ বেশি টাকা পাওয়া যাবে এবং ভারতীয় জনসাধারণের আয়ও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। অবশ্য, এ রকম উন্নতি করতে হ'লে ছোট ছোট জমি নিয়ে সেকেলে যন্ত্রপাতিতে চাষ-বাস প্রথা একবারেই ছেড়ে দিতে হবে—সরকারী ঔদাসীন্য থাকলেও চলবেনা এবং ভারতে তখন বিরাট আকারে যৌথ কৃষি-ব্যবস্থায় চাষ-বাস করার প্রয়োজন হবে।

সাম্রাজ্যবাদের যারা বিশেষজ্ঞ তারাও স্বীকার করেছেন যে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষ-বাস করতে হ'লে অনেক জমি একত্রে নিয়ে বড় আকারে চাষ-বাস করতে হয়।

"ষ্টীম-ইঞ্জিন চালিত লাঙ্গল প্রভৃতি বড় আকারে চাষ-বাসের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় ; কিন্তু বড় খামার না হ'লে এবং পুঁজিও যথেষ্ট না জুটলে এগুলি ব্যবহার করা যায় না। —এদের দ্বারা ভালো কাজই পাওয়া যায় এবং পূর্বোক্ত সুযোগ

পেলেই তবে এদের ব্যবহার সম্ভব। তবে যদি সমবায়-প্রথার ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে এই যন্ত্রগুলির চাহিদা বাড়ানোর আশা করা যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এ আশা সুদূরপরাহত।" —Wynne Sayer, of the Imperial Agricultural Research Institute, New Delhi, "Use of Machinery in Agriculture" in the Times Trade and Engineering Supplement, April, 1939)

সাম্রাজ্যবাদের বিশেষজ্ঞদের মতেই এ আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু এঁরা যা মনে করেছেন ব্যাপারটা ঠিক তা নয়—। ভারতের ধ্বংসোন্মুখ কৃষক ও ভূমিহীন মজুরের জাগ্রত শক্তি অদূর ভবিষ্যতে দেখিয়ে দেবে যে এ আশা সুদূরপরাহত নয়। মাত্র কুড়ি বছরে জার-শাসিত মরণোন্মুখ কৃষক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে ; প্রথমে তারা নতুন ভাবে জমির বিলি-ব্যবস্থা ক'রে বর্তমানে কৃষি-সমবায় ও কৃষি-যৌথে মিলিত হয়ে যে-রকম দ্রুত উন্নতি করেছে—সোভিয়েট ইউনিয়নের সেই দৃষ্টান্ত ভারতের কৃষকের কাছে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

সরকারী সংস্কারমূলক নীতির ব্যর্থতা

কৃষি-সমস্যার এই মৌলিক সমাধান কি বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী যুগে সম্ভব ? —কোনো রকমেই সম্ভব নয়। এই শাসন-ভার যাদের উপর ন্যস্ত তাদের মনে সৎ-অসৎ যে-কোনো উদ্দেশ্যই থাকুকনা-কেন তাদের দ্বারা কোনো-কিছুই হবে না—হতে

পারে না। এক দিকে জনসাধারণের স্বার্থ ও শক্তিকে দাবিয়ে রাখার জন্য সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থ জমিদারী-প্রথা ও অর্ধসামন্ত-যুগীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে কায়েম রেখে চলেছে—অন্য দিকে বৃটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে অনুন্নত কৃষিজীবী দেশ হিসাবে চিরকাল ধ'রে শোষণ করবার জন্য বেঁধে রেখেছে! —এই স্বার্থ বলী দিয়ে তারা কখনো কৃষকের উন্নতির কথাও ভাববে না। —এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই কৃষি-সমস্যার মৌলিক সমাধানে বাধা দেবে। এ কার্য যে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় হতে পারে না—তা তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে। ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ১৭০ বছর পরে বৃটিশ ভারতের কৃষি ও গ্রাম-দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে ১৯২৭ সালে রাজকীয় কৃষি-কমিশনের নিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু এই কমিশনকে পরিষ্কার ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কে তারা যেন একটী কথাও না বলে। এই রকম অনুশাসন থাকার ফলে কৃষি-কমিশনের রিপোর্ট ও সাক্ষ্য সম্বলিত ১৭ খানি কেতাব কেবল বই রাখার আলমারীই সাজিয়ে তোলার পক্ষে উপযুক্ত হয়েছে। কেননা, এ-হেন কমিশনও যতটুকু ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য সরকারকে সুপারিস করেছিল তা গ্রাহ্য করা হয়নি, যে দুর্দশার কথা সর্বসাধারণের গোচরে এনেছিল—তার প্রতিকার হয়নি। তাই কৃষি-সঙ্কট এর দ্বারা লাঘব হওয়া তো দূরের কথা বরং এই রিপোর্টের পরে তা আরও দুর্দমনীয় হয়ে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা-যে কৃষি-সঙ্কটকে দূর করতে পারে না, তা আরো অনেক রকমে প্রমাণ হয়ে গেছে। কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্পর্কে যে-সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে তা বর্তমান অবস্থায় কৃষক-জনসাধারণের কোনো কাজেই আসবে না ; যতদিন উন্নত প্রকারের যন্ত্রপাতি যোগাড় করার মতো সম্পদ কৃষকের না হয়, যতদিন জমি-স্বত্ব সম্পর্কিত ব্যবস্থা কৃষকের সুবিধামতো না হয় এবং যতদিন তার দারিদ্র্য, অজ্ঞতা ও উপবাস না ঘোচে,—ততদিন ঐ সব সরকারী প্রতিষ্ঠানের কোনো অর্থ ই কৃষকদের কাছে নেই। কৃষি সম্পর্কিত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য সরকার কতটুকুই-বা খরচ করেন ? ১৯৩৬-৩৭ সালের হিসাবমতো দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বাজেটের মাত্র ১'৪ অংশ—অর্থাৎ ২২-১/২ লাখ পাউণ্ড—এতবড় দেশের কৃষি-কার্যের উন্নতির জন্য ব্যয় হয়েছে। আর, দিল্লীতে যে রাজকীয় কৃষি-গবেষণাগার (Imperial Agricultural Research Institute) আছে তাও তো চলে আমেরিকার একটী কোটীপতির চাঁদায় !

সরকার যে-সকল ছোটখাটো আইন ক'রে কৃষকের দুর্দশা লাঘব করার চেষ্টা করেছেন, সে-সকল আইন শেষ পর্যন্ত গরীব কৃষকের বিশেষ-কিছুই উপকার করতে পারেনি—বরং অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষককে ক্ষুদে জমিদারে পরিণত করতে সাহায্য করেছে এবং এইভাবে জমিদারী প্রথাকে বিস্তৃত করতেই সাহায্য করেছে ;—এটা কৃষি-কমিশনও স্বীকার করেছেন।

তারপর জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা। —বহুকাল ধ'রে এ ব্যাপারটা তো রীতিমতো অগ্রাহ্য করাই হয়েছিল। তারপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে যেটুকু ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করেছে—তাই নিয়ে সরকারপক্ষ থেকে সাফাই গাওয়ার আর অন্ত নেই! —কিন্তু সরকারী হিসাব থেকেই দেখা যায় যে ভারতে যত চাষের জমি আছে—তার শতকরা মোট ১৮ ভাগে জল সেচনের ব্যবস্থা আছে এবং তার মধ্যে মাত্র ১১ ভাগ সরকারী ব্যবস্থায় জল পায়। (১৯৩৫-৩৬ সালে ২৭ কোটী ৯০ লাখ একর জমির মধ্যে ৫ কোটী ১০ লাখ একর জমিতে এই ব্যবস্থা ছিল,—এর মধ্যে আবার মাত্র ৩ কোটী ১০ লাখ একর জমি সরকারী ব্যবস্থায় জল পায়।) কিন্তু সরকারী বা বে-সরকারী সাহায্যে যেটুকু জল কৃষকেরা জমির জন্য পায়—তার জন্য তাদের যে-পরিমাণ খরচ করতে হয় তা গরীব কৃষকদের পক্ষে সঙ্কুলান করা সম্ভব নয়। তাই এই খরচটাও কৃষকদের বোঝার অন্যতম।—১৯১৮-২১ সালে জল সেচন বিভাগ থেকে সরকারের লাভ হয়েছিল শতকরা ৭।৮৲ এবং ১৯৩৫-৩৬ সালে প্রায় ৬৲ টাকা।

কৃষি-সঙ্কট দূর করার জন্য সরকারপক্ষ শেষ দাওয়াই ছেড়েছে সমবায় সমিতি সৃষ্টি ক'রে। আসলে এই ম্যাজিক-দাওয়াই প্রয়োগ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—কর-বন্ধ ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলনকে রোধ করা। মিঃ ডার্লিং সরল মনে একথা ফাঁস ক'রে দিয়েছেন। কংগ্রেসের কর-বন্ধ আন্দোলন সম্পর্কে

বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "পাঞ্জাবের একটা জেলা এই বাজে আন্দোলনের প্রভাবে পড়েছিল ; এবং অনুসন্ধান ক'রে জানা যায় যে এই জেলার মাত্র একটী গ্রামে সমবায়-ঋণদান সমিতি আছে।" তিনি আরো বলেছেন, "এই ধরণের আন্দোলন রোধ করার জন্য সমবায় প্রথাই সবথেকে ভালো দাওয়াই ; এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গত বছরে এই প্রদেশে যে ২০,০০০ সমবায় সমিতি করা হয়েছিল—তার ফলে, আইন অমান্য আন্দোলন অনেক সহরে গোলমাল সৃষ্টি করলেও—গ্রাম-দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে সমর্থ হয়নি।" (Wealth and Waste in the Funjab Village—by M. L. Darling, 1934, p. 83—4)

দুঃখের বিষয়, সরকারপক্ষের এই আশা দুরাশায় পরিণত হয়েছে। কারণ, গরীব কৃষকদের এমন সামর্থ্যও নেই যে তারা সমবায়-ঋণদান সমিতির সভ্য হতে পারে। তাই সমবায়-ঋণদান সমিতি বিপুল সংখ্যক গরীব কৃষকদের কিছুই করতে পারেনি। যতটুকু করেছে তাতে কেবল অপেক্ষাকৃত ধনী কৃষকদেরই সুবিধা হয়েছে। ধনী কৃষকেরা সরকারী সাহায্য না পেলেও এমনিই কোনো-রকম আইন অমান্য আন্দোলনে জড়িত হতে চায় না। বাংলা প্রদেশের ব্যাঙ্কিং এনক্যোয়ারী কমিটীর রিপোর্টের ৬৯ পাতায় আছে ঃ

—"একদল লোক আছে যাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো ; এবং সেই কারণে তারা সমবায়-ঋণদান সমিতির সভ্য হয়ে

একগাদা দেনার দায় ঘাড়ে নিতে রাজী হয় না। অপর দিকে আর একদল লোক রয়েছে—যারা এত গরীব যে, তাদের সমিতিতে নেওয়াই হয় না। সুতরাং সমবায় সমিতিগুলিকে মধ্যবিত্ত কৃষকদের দ্বারা গঠিত বললে কিছু অন্যায় হয় না।”

অ্যান্‌ষ্টে তাঁর “Economic Development of India” বই-এর ২০২ পৃষ্ঠায় বলেছেন: “আর-একটা অসুবিধার কথা এই যে, যে-সকল জেলা অত্যন্ত গরীব এবং যেখানে সাহায্য অত্যন্ত দরকার সেখানে সমবায়-ঋণদান সমিতিগুলি কোনো কাজেই লাগে না। কারণ, জলবায়ুর মন্দ অবস্থা বা জমি টুকরো-টুকরো থাকার দরুণ এমন চাষীরা রয়েছে, যারা ঋণ পেলেও তাদের জমি থেকে তা কখনও শোধ দিতে পারবে না। সুতরাং সেখানে ঋণ দেওয়া নিরর্থক। অতএব দেখা যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী যায়গাতে সমবায়-ঋণদান সমিতি সার্থক হয়েছে।”

এখন, এই ‘অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী যায়গা’ কতখানি তা আন্দাজ করা খুব কঠিন নয়; এবং তা থেকে বোঝা যাবে, সমবায় প্রথা বর্তমানে ভারতকে কতখানি উপকার করতে পেরেছে। ১৯৩৫-৩৬ সালে বৃটিশ ভারতের সমবায় সমিতির সদস্য সংখ্যা হ’ল ২,৫৯৮,০০০—অর্থাৎ সমস্ত গ্রামবাসী জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ মাত্র। সরকারী কৃষি-কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামবাসী পরিবারগুলির শতকরা ক’টা লোক সমবায়-ঋণদান সমিতিভুক্ত তা পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হ’ল:

বাংলা—	শতকরা	৩'৮	ভাগ
বোম্বাই—	,,	৮'৭	,,
মধ্য প্রদেশ—	,,	২'৩	,,
মাদ্রাজ—	,,	৭'৯	,,
পাঞ্জাব—	,,	১০'২	,,
যুক্ত-প্রদেশ—	,,	১'৮	,,

রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, "বোম্বাই, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ ছাড়া অন্যান্য প্রধান প্রধান প্রদেশগুলিতে এই সমবায় আন্দোলন—গ্রাম-অধিবাসীদের অতি অল্প লোকের মধ্যেই বিস্তৃত হয়েছে।" এই সংখ্যা থেকে দেখা যায়, বাংলা ও যুক্ত-প্রদেশে—যেখানে কৃষকের দারিদ্র্য অত্যন্ত বেশি, সেখানে কত অল্প লোক সমবায় সমিতির সাহায্য নিতে সক্ষম। কৃষকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ধনীরাই যে এই প্রথায় লাভবান হয়—তা এই সংখ্যা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে।—যতদিন কৃষকদের বর্তমান অসুবিধা দূর ক'রে দেওয়া না যায়, কৃষকদের বোঝা যতদিন না হাল্কা ক'রে দেওয়া যায়, ততদিন সমবায় সমিতি কৃষক-জন-সাধারণের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না।

বর্তমান কৃষি-ব্যবস্থার মূল দুর্দশাকে দূর করতে হ'লে সমগ্র ব্যবস্থাকে নতুন ক'রে গড়তে হবে এবং সেই গড়ার কাজে ভূমি-স্বত্ব সম্পর্কিত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে!—তবেই কৃষকদের এই জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনে-যে সেটা হতে পারেনা, ভারতের জনগণের দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থাই-যে কেবল তা করতে পারে —এই যুক্তি সরকার-পক্ষীয় লোকদের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছে। টমসন ও গ্যারেট সাহেব তাঁদের "Rise and fulfilment of British Rule in India—" (১৯৩৪) পুস্তকের ৬৪৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন ঃ "গ্রাম-বাসীদের জীবন-ব্যবস্থা যে অবিলম্বে সংস্কার করা দরকার তা রাজনৈতিক নেতা বা সরকারী কর্মচারী সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু যে-সকল বিশেষ বিশেষ দাওয়াই প্রয়োগ করা হয়েছে সেগুলি কিছুই কাজ করতে পারেনি ;—তাদের দ্বারা উপকার পেতে হ'লে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার--যার জন্য ভারতবর্ষ যতদিন স্বাধীন না হয় ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

অ্যান্‌ষ্টে তাঁর "The Economic Development of India" 1936-এ বলেছেন ঃ "কেউ-কেউ বলেন যে সবথেকে ভালো উপায় হচ্ছে, এক-একটা যায়গা নিয়ে—সেখানকার পারিবারিক এবং আইনগত যাবতীয় অধিকারগুলিকে উচ্ছেদ ক'রে নতুন ব্যবস্থা পত্তন করা। ('The consolidation of Agricultural Holdings in the United Provinces,' by H. Stanly Jevons—1918, Bulletin No. 9 of the Economic Department of Allahabad University) সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা মঞ্জুর করার আগে এই উপায় অবলম্বন করা একেবারেই অসম্ভব।" (১০১ পৃঃ)

"কৃষি-কার্যে উন্নতি করার যে-সকল উপায় জানা আছে, তা প্রয়োগ করলে অবশ্যই কৃষি-উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনে দেওয়া যায়। কিন্তু যে-সকল প্রধান কারণ কৃষি-ব্যবস্থাকে অতীত দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে সুদূর ভবিষ্যতে রোধ করতে সুধু সেই সরকারই সাহস করতে পারে যার উপর সমস্ত শাসিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও সমর্থন আছে।" (১৭৭ পৃঃ)

ভারতবর্ষে কৃষি-সমস্যার সমাধান করতে হ'লে যে মৌলিক পরিবর্তন দরকার—এটা এঁরা নির্ভুল ভাবেই মেনে নেন। কিন্তু এঁদের যুক্তিগুলির প্রকৃত অর্থ হ'ল, তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়—একথা যেন ভারতের লোকে মেনে নেয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা করতে হ'লে যে জনগণের বিশ্বাসভাজন গভর্ণমেণ্ট দরকার তা এঁরা সকলেই স্বীকার করেন। এই সম্পর্কে রাজকীয় কমিশনে এমন একটা মন্তব্য আছে যা পড়লে মনে হয়, কমিশনের সভ্যরা হঠাৎ যেন ভুল ক'রে সত্য কথা ব'লে ফেলেছেন,—"যেখানে সমস্যা হ'ল ৫ লাখ গ্রাম নিয়ে—সেখানে কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠান-যে গ্রামের প্রত্যেক লোককে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না, এটা বলাই বাহুল্য। এটা করতে হ'লে নিজেদের সুবিধার জন্যই গ্রামে গ্রামে জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে এবং তাদের স্থানীয় সংগঠনগুলিকে বড় বড় সমিতিভুক্ত ক'রে নিয়ে এমন একটী সংগঠন-রূপ যন্ত্র তৈরী করতে হবে—যার দ্বারা প্রত্যেক

বিভাগের বিশেষজ্ঞদের প্রেরিত সব-কিছু সাহায্য গ্রামে গ্রামে পৌঁছাবে।" (৪৬৮ পৃঃ)—এই মন্তব্য করার সময় কৃষি-কমিশনের কর্তারা ভেবেছিলেন যে তাঁরা বোধ হয় সাদা-সিধে ঘটনারই বিবৃতি করেছেন। কিন্তু এতেই যে ভবিষ্যৎ গ্রাম্য সোভিয়েটগুলির পরিকল্পনা ছ'কে দেওয়া হয়েছে—একথা কি তাঁরা ভেবেছিলেন, না, ভাবার ইচ্ছা করেছিলেন ?

এই রকম 'সদয় স্বীকারোক্তির' নজির অনেক মিলবে, তবে ফলাফলের দিক থেকে সবই সমান। সম্প্রতি বাংলা দেশে 'ভূমি-রাজস্ব কমিশনের' যে রিপোর্ট (Floud Commission Report) বের হ'ল—তাতে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' করতে করতেও কমিশনের অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, বাংলা দেশে জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব প্রথার ফলেই কৃষকদের এই চরম দুর্দশা হয়েছে ; —অতএব আর্থিক, রাষ্ট্রীক ও রাজনৈতিক সবদিক থেকেই বিবেচনা করলে অবিলম্বেই এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ-সাধন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই প্রসঙ্গে ফ্লাউড কমিশনের মূল সুপারিশগুলির সংক্ষেপে মর্মালোচনা করা যেতে পারে। বাংলা দেশের ভূমি-ব্যবস্থা—দশ-সালা ও ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের ত্রুটি, ফলাফল ও কার্যকারিতা বিশদভাবে বিচার-বিবেচনা ক'রে কমিশনের অধিকাংশ সভ্য যে সব সুপারিশ করেছেন তার মর্মার্থ এই রকম দাঁড়ায়ঃ

(১) জমিদারী প্রথা ও পারতপক্ষে সবরকম মধ্যস্বত্ব ও খাজনাভোগী সম্প্রদায়ের বিলোপ করা উচিত ; এবং ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ স্বত্বের উদ্ভব না হয়—তারও ব্যবস্থা করা উচিত।

(২) প্রজাদের সরাসরী সরকারের অধীনে এনে জমিদারী প্রথার পরিবর্তে রায়তোয়ারী প্রথা প্রবর্তন করা উচিত।

(৩) তা করতে হলে জমিদার ও অন্যান্য স্বত্ব-ভোগীদিগকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত।

(৪) কৃষি-আয়কর প্রবর্তন করা উচিত ; জমিদারী অমোলের বকেয়া খাজনা আদায় করা উচিত ; আর খাজনা প্রথা যদি রাখতেই হয় তবে বর্তমানের হারই বহাল থাকা উচিত।

এ ছাড়া আরও বহু আনুষঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সুপারিশ তাঁরা করেছেন। কিন্তু 'সাপও না মরে লাঠিও না ভাঙে'—এই নীতি অবলম্বন করতে গিয়ে তাঁরা সবই পণ্ড করেছেন। প্রথম দফায় মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ করতে ব'লেও বর্গাদারদের স্বত্ব রেহাই দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় দফায় রায়তোয়ারী প্রথা প্রবর্তন করতে বলা হয়েছে। অথচ কমিশনের রিপোর্ট থেকেই জানা যায়, খাজনার দিক দিয়ে দেখলে বাংলার কৃষকদের চেয়ে অন্য প্রদেশের রায়তোয়ারীর অধীন কৃষকদের অবস্থা তো আরও বেশি শোচনীয়। জমির পরিমাণ অনুপাতে খাজনা ধার্য করার প্রথা সমূলে উচ্ছেদ ক'রে একটা নির্দিষ্ট নিম্নতম

কৃষি-আয়ের উপর লাভের পরিমাণ অনুপাতে আয়কর প্রথা প্রবর্তন করলে তবে জমিদারীর পরিবর্তে রায়তোয়ারী প্রথায় কোনো সুবিধা হতে পারত।

তৃতীয় দফায় ক্ষতিপূরণের সুপারিশ। কৃষকদের যখন নাভিশ্বাস উঠছে তখন তার গলায় পা দিয়েও যে আর-কিছু আদায় হবে না—একথা খাজনাভোগীরা এখন বেশ বুঝতে পারছে; —তাই খেসারতের সুপারিশ তাদের 'হাতে স্বর্গ' এনে দিয়েছে। ১৭৯৩ সালে সরকারের মর্জি অনুযায়ী আইন ক'রে যে-অধিকার জমিদারদের দেওয়া হয়েছিল, আজ যদি তেমনি আইন ক'রেই সেই অধিকার তুলে নেওয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে জমিদার বা জমিদার-সৃষ্ট মধ্যস্বত্ব ভোগীদের তরফ থেকে খেসারতের দাবী করা হয় কোন ন্যায়-বিচারের বিধানে? তাঁদের ক্ষতিটা কোথায় যে-তা পূরণ করতে হবে? অনধিকার-প্রবেশকারীকে দক্ষিণা দিয়ে বিদায় করবার রীতি কোথাও নেই—বরং ন্যায়ের বিচারে তার কাছেই খেসারত তলব করা বিধি। যদি এককালে আইনের বলে এসেছিলেন আর এখন যদি আইনের বলেই স'রে যেতে হয়—তবে অযথা উচ্চবাচ্চ না করাই ভালো। তা না হলে প্রজাদের সুখ-সুবিধার্থে যে-যে কর্তব্য করার জন্য তাঁরা আইনত বাধ্য ছিলেন, সে সব কর্তব্যের কিছু-মাত্রও না ক'রে এতকাল ধ'রে এই নিরীহ নিঃসম্বল চাষী-প্রজাদের যে বিরাট ক্ষতি তাঁরা করেছেন—তা পূরণ করার

দাবী করলে কি তাঁরা আজ খেসারত দিতে প্রস্তুত আছেন? বিশেষ ক'রে মধ্যস্বত্বের দরুণ যা খেসারত তা জমিদারদেরই বহন করা উচিত—তাঁরাই তো নিজেদের স্বার্থে টাকা নিয়ে নিয়ে তাঁদের স্বত্বাংশ বিক্রী ক'রে ক'রে এই সব বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি করেছেন আর প্রজাদের যতটা ক্ষতি তাঁরা নিজেরা করতেন তার চেয়ে শতগুণ বেশি ক্ষতি করবার ষড়যন্ত্রে সাহায্য করেছেন।

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পন্থাও অদ্ভুত! বিভিন্ন সভ্যের মতে বিভিন্ন স্বত্বের সম্পত্তির জন্য বিভিন্ন হারে (সম্পত্তির বাৎসরিক নীট আয়ের ১০ থেকে ২৫ গুণ পর্যন্ত) ক্ষতিপূরণের কথা উঠেছে; —একসঙ্গে না হলে ৬০ বছরের মেয়াদী সরকারী ক্যাশ সার্টিফিকেট দিয়ে এই দাম দেওয়া হবে। এই টাকাও তো শেষ পর্যন্ত—যাদের দুর্দশায় কাতর হয়ে কমিশনের নিয়োগ হয়েছিল—সেই দরিদ্র কৃষকদেরই উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর ধার্য ক'রে আদায় করা হবে!

চতুর্থ দফায় সে পন্থারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—কৃষি-আয়কর প্রবর্তন। কথাটা ভালো। কিন্তু সর্তহীন ভাবে জমিদারী প্রথা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না ক'রে কৃষি-আয়কর প্রথা প্রবর্তন করলে তার ফল ভয়াবহ হওয়ারই সম্ভাবনা। আর বকেয়া খাজনা আদায় নির্দেশের মধ্যে তো কোন যৌক্তিকতাই নেই! —কে দেবে? কোত্থেকে দেবে? যদি দিতেই পারবে তবে আর কমিশন নিয়োগের দরকারটাই-বা কী ছিল?

পাকাপাকি পরিবর্তন যতদিন না হয় ততদিন বর্তমান খাজনার পদ্ধতি ও হার বহাল থাকবে—এই নির্দেশে শেষ পর্যন্ত এত সব 'বজ্র আঁটুনির ফস্কা গিরোটা' প্রকাশ হয়ে পড়েছে !

এর পরেও কথা আছে। যে দেশে 'পুরুতের ইচ্ছায় ধর্ম' আর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' নিয়ন্ত্রিত হয়—সে দেশে এটা আদৌ তাজ্জব ব্যাপার নয় যে, এই কমিশনের অনুসন্ধান-ফল ও সুপারিশগুলি স্থানীয় সরকার গ্রহণ করতেও পারেন, নাও পারেন,—কোনো অংশ কার্যে পরিণত করতেও পারেন আবার নাও পারেন। সেই কারণেই—ভালো ভালো সুপারিশ কয়টীর সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলো বিকল্পসিদ্ধ মারাত্মক সুপারিশ করা হয়েছে যে, এই উপদেশের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই স্থানীয় সরকার এমনভাবে ঐ পরের সুপারিশ গুলি ব্যবহার ও প্রয়োগ করতে পারেন—যাতে কৃষকের অধিকতর সুবিধা তো দূরের কথা—সমূহ সর্বনাশ হওয়ারই আশঙ্কা করা যায়।

গভর্ণমেণ্ট যদি একমাত্র কৃষকদের ন্যায্য স্বার্থের দিকেই প্রসস্ত দৃষ্টি না রেখে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তবে কমিশনের সুপারিশ মতেই এমনও হতে পারে যে, যে চাষীরা আজ পৃথিবীর যাবতীয় রোগ, দারিদ্র্য, অভাব, অশিক্ষা, ঋণ খাজনা, সুদ ইত্যাদির চাপে মাটী থেকে ঘাড় তুলতে পারছে না,—তাদেরই ঘাড়ে আবার নতুন ফন্দীতে খাসমহলের জুলুম, কৃষি-আয়কর, বর্তমান খাজনা, পুরানো খাজনার নালিশ,

জমিদার ও মধ্যস্বত্বের খেসারতের দায় ইত্যাদি সব-কিছু চেপে বসবে—অন্তত ৬০ বছর মেয়াদের মধ্যে তার আর রেহাই থাকবে না। কৃষকদের ভালো করবার পথ খুঁজতে গিয়ে মন্দ করবার এত পথেরই সন্ধান কমিশনের সুপারিশে আছে যে তা অত্যন্ত আক্ষেপ ও আশঙ্কার বিষয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে এই রকম জোড়াতালি দিয়ে কিছুই হবে না, হতে পারে না। এইসব কারণেই ভারতের কৃষি-সঙ্কটরূপ সমস্যার সমাধান—ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পত্তনের সমস্যা সমাধানের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। দু'টোকে পৃথকরূপে দেখা বা দুই সমস্যাকে পৃথক ভাবে সমাধান করা অসম্ভব।

কৃষক আন্দোলনের সূচনা

এই অবস্থা মনে ক'রে রাখলে আজ-যে এদেশে দিকে দিকে কৃষক আন্দোলন বেড়ে উঠেছে তার তাৎপর্য সহজে বোঝা যাবে। ভারতে ইংরাজশাসনে বার-বার কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ ঘটতে দেখা যায়। প্রথমে এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল—এখানে-ওখানে জমিদার বা মহাজনের উপর অত্যাচার ক'রে বা কোনো রকমের প্রতিশোধ নিয়ে কৃষকেরা তাদের গায়ের জ্বালা মেটাত। কৃষকদের দুঃখ-যে একটা ব্যবস্থার জন্য—কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়—এটা তারা এখনও বোঝেনি। ১৮৫২ সালে বোম্বাই সরকারের কাছে প্রদত্ত সার জর্জ

উইনগেটের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, "আমাদের এই প্রদেশের একেবারে দুই বিপরীত প্রান্তে খাতক কর্তৃক দু-দু'টো মহাজন যে নিহত হ'ল—তা একজন মহাজনের অত্যাচারের ফল ব'লে পৃথক ক'রে দেখা উচিত নয়। আসলে সমস্ত মহাজন সম্প্রদায় ও খাতক-কৃষকদের মধ্যে যে ব্যাপক শোষণের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, তারই তীব্রতর রূপ এই ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। এই ঘটনা দু'টীতে প্রকাশ পাচ্ছে, এক পক্ষ কি সাঙ্ঘাতিক অত্যাচারই-না করেছে এবং অন্য পক্ষ কতদূর সহ্য করেছে ! এদেশের কৃষকের সহ্যগুণ সর্বজনবিদিত। দীর্ঘকাল ধ'রে ছোট-খাটো অন্যায় অত্যাচার এরা মুখবুজে সয়ে নেয়। সুতরাং অবস্থা-না-জানি কতখানি অসহ্য হয়েছে—যার ফলে এরা চিরকালের সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের জীবন তুচ্ছ ক'রেও নরহত্যার দ্বারা দুর্দশা দূর করবার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছে। তাদের ন্যায়-অন্যায়-বোধ না-জানি কত তীব্র ভাবেই পীড়িত হয়েছে ! দেশের আইন বা সরকার তাদের-যে কোনো সাহায্যই করবেনা—এই হতাশা তাদের কতখানি ব্যাকুল করেছে যার ফলে তাদের ধৈর্য ও শান্তি নষ্ট ক'রে তাদেরকে এমন কার্যে লিপ্ত হতে হয়েছে !" —(Sir George Wingate, Report to the Bombay Government in 1852)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যে-সকল কৃষক-বিদ্রোহ হয় তার মধ্যে ১৮৫৫ সালে সাঁওতালদের ও ১৮৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পর থেকে কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ অভূতপূর্ব ব্যাপকরূপে বিস্তৃতিলাভ করেছে। কৃষক আন্দোলন ক্রমশ অগ্রগামী পন্থা অবলম্বন ক'রে আসছে। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট ভারতের কৃষি-সঙ্কটকে সুধু তীব্রতর ক'রেই ক্ষান্ত হয়নি,—কৃষককে তাদের সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। তাই মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচার প্রতিহত করার জন্য কৃষকদের নিজেদের প্রেরণায় ও চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতি গ'ড়ে উঠেছে।

কৃষকদের নিজেদের দাবীর উপর ভিত্তি ক'রে কৃষকেরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃশীর্ষ কখনও স্থানীয় কৃষক সমিতিগুলিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেননি। বস্তুত, কংগ্রেস-নেতৃত্বের ধনিক শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বহুদিন যাবৎ কংগ্রেসকে কৃষকের চক্ষে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বস্তু ক'রে রেখেছিল। এই সব কারণে কৃষকেরা নিজেদের স্বতন্ত্র গণপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে থাকে এবং গ্রামের কৃষক সমিতিগুলি পরস্পর যোগাযোগ সৃষ্টি ক'রে জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি গঠন করতে থাকে।

১৯৩৬ সালে ফৈজপুরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলন হয় ও নিখিল ভারত কৃষক সভার সৃষ্টি হয়। এই সম্মেলনে ২০,০০০ কৃষক

যোগদান করে এবং এদের মধ্যে অনেকে শত শত মাইল দূর থেকে হেঁটে আসে।

এদিকে ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের বিফলতার পর কংগ্রেসের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রবল হতে থাকে। কংগ্রেসকে মধ্যবিত্ত সংগঠন থেকে কৃষক-মজুরের সংগঠনে পরিণত করার জন্য চেষ্টা হয়; তারই ফলে কৃষকদের দাবীর ভিত্তিতে কৃষি-উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব এই ফৈজপুর কংগ্রেসে গৃহীত হয়। এই ভাবে কংগ্রেস ও কৃষক সভার রাজনৈতিক আদর্শ সমসূত্রে গ্রথিত হ'ল ব'লে ঘোষণা করা হয়।

১৯৩৮ সালে কুমিল্লায় যখন নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন হ'ল, তখন দেখা গেল এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য সংখ্যা ৫৫০,০০০ হয়েছে; এবং ২০টী ভাষা-ভাষী প্রদেশের ১৯টীতে প্রাদেশিক কৃষক সভা সৃষ্টি হয়েছে। এই অধিবেশনে জমিদারী প্রথা ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে এবং কৃষকদের দৈনন্দিন দাবী-দাওয়ার উপর ভিত্তি ক'রে সংগ্রাম চালনার পক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়।

১৯৩৭ সালে কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রীত্ব গৃহীত হওয়ার পর কৃষক আন্দোলনের প্রাবল্য বৃদ্ধি পায়; এবং ১৯৩৮ সালের সারা বছরটীতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কৃষকদের বহুমুখীন সমস্যার ভিত্তিতে কৃষকেরা সংগ্রাম চালাতে থাকে। মূখ্যত কর-বৃদ্ধি, বেগার প্রথা, বে-আইনী আদায়, জমি থেকে উচ্ছেদ করা প্রভৃতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামগুলি চালিত হয়েছিল

এবং অনেক ক্ষেত্রে কৃষকেরা সাফল্য লাভও করেছিল। এই সময় দেখা গেছে যে ৩০।৪০ হাজার কৃষক দলে দলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, তাদের দাবী ও জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক দাবী সম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ করেছে, তাদের সংগঠন থেকে সাপ্তাহিক পত্র বার করেছে, গ্রামে গ্রামে রাজনৈতিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছে—এবং কৃষক সভার মারফৎ জাতীয় কংগ্রেসকে কৃষক-সাধারণের কাছে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এর ফলে, তারা কংগ্রেস-মন্ত্রীদের উপর চাপ দিয়ে তাদেরকে জমিদারী প্রভাব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছে এবং কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য আইন প্রণয়ন করানোর ব্যবস্থা কিছুটা করেছে।

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে গয়াতে নিখিল ভারত কৃষক সভার চতুর্থ অধিবেশন হয় এবং এখানে প্রকাশ পায় যে কৃষক সভার তৎকালীন সভ্য সংখ্যা ৮০০,০০০। এই সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবটীর কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ

"গত বৎসরে ভারতের কৃষক আন্দোলনের সংগঠন শক্তি ও রাজনৈতিক জাগরণ অত্যাশ্চর্য রূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকেরা সুধু-যে দেশের সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অধিকতর রূপে যোগদান করেছে এমন নয়; তারা বুঝেছে যে নিষ্ঠুর সামন্ততন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে তারা শ্রেণী হিসাবে প্রাণপণে লড়াই ক'রেই বাঁচবার চেষ্টা করছে। এই কারণে তাদের শ্রেণী সংগঠন ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে এবং

পূর্বোক্ত শোষণের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই ক্রমশই উচ্চস্তরে উন্নীত হচ্ছে। তাদের ছোট ছোট দাবীর উপর লড়াইগুলি থেকেই এটা বোঝা যায়। এই লড়াইগুলি তাদের মধ্যে নতুন ধরণের রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার করেছে। কী ধরণের শক্তির বিরুদ্ধে তারা লড়ছে এবং শোষণ ও দারিদ্র্য নিরাকরণের প্রকৃত উপায়ই-বা কী—তা তারা বুঝতে পেরেছে। দেশের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিগুলির সহযোগে তারা লড়ছে ব'লেই তারা-যে আজ কোনো প্রতিষ্ঠানের লেজুড় —একথা মনে করার কারণ এখন আর নেই। তারা জানে, তাদের আদর্শ সুস্পষ্ট। তারা জানে যে তাদের দৈনন্দিন সংগ্রামের যুক্তি-সিদ্ধ পরিণতি হ'ল—সাম্রাজ্যবাদকে প্রবল আক্রমণে পরাস্ত করা এবং তাকে হটিয়ে দিয়ে কৃষি-ব্যবস্থায় এমন এক বিপ্লব সৃষ্টি করা, যার ফলে কৃষকেরা জমি পাবে, কৃষক ও সরকারের মধ্যে কোনোরূপ মধ্য-স্বত্বভোগী থাকবেনা, কৃষক ঋণমুক্ত হবে এবং নিজেদের পরিশ্রমের ফল তারা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতে পারবে।

"গত বৎসরে প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছ থেকে কৃষকেরা সামান্য কিছু সংস্কার আদায় করতে পেরেছে। কিন্তু এই সংস্কারগুলি মোটেই যথেষ্ট নয়। কায়েমী স্বার্থের দল এই সব সংস্কার সাধনের পথে যে-সকল প্রবল বাধা সৃষ্টি করেছে—তাতেই বেশ বোঝা যায়, প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসনও মূল কৃষি-সমস্যা সমাধানে চিরকেলে অক্ষমতার পরিচয়ই দিয়েছে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন-যে কত খেলো তা এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। ভারতের কৃষকেরা-যে সামন্ততন্ত্রী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ উচ্ছেদ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এ কার্যে তারা-যে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রস্তুত হয়েছে—একথা ঘোষণা করতে এই সংগঠন গর্ব বোধ করছে।

"... কৃষক সভার দৃঢ় অভিমত এই যে, আজ এমন সময় উপস্থিত যখন দেশের সমস্ত শক্তি—কংগ্রেস, দেশীয় রাজ্যের জনগণ, কৃষক, মজুর এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও জনগণ সমবেত ভাবে অগ্রসর হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দাসত্ব ব্যবস্থাকে আক্রমণ করুক; পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা ও ভারতের জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করুক; এবং এমনি ক'রে ভবিষ্যতে এই রাষ্ট্র কৃষক-মজুরের রাষ্ট্রে পরিণত হোক।"

১৯৪০ সালে পালাশায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কৃষক সভার পঞ্চম অধিবেশনে বর্তমান সময়ের উপযোগী নিম্নলিখিত মূল সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়ঃ—

১। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও তৎপর গণপরিষদের মারফৎ ভারতে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন।

২। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অপসারণ ও গণ-সেনা গঠন।

৩। বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ।

৪। সমস্ত ঋণ মকুব।

৫। কলকারখানা, জমি, ও চা-রবার-কফি বাগানের মজুরদের ৮ ঘণ্টা রোজ ও বেঁচে থাকবার উপযোগী মজুরী।

৬। সমস্ত ভারতবাসীকে খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার গ্যারান্টি।

৭। লাভহীন জমির খাজনা ও রাজস্ব মকুব।

৮। কলকারখানা, খনি, ব্যাঙ্ক, রেলপথ, জাহাজ, চা-রবার-কফি বাগান প্রভৃতিতে নিযুক্ত বিদেশী পুঁজির বাজেয়াপ্তি করা ও শিল্পগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা।

৯। বিদেশী দেনা অস্বীকার।

কৃষক আন্দোলনের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে—আর সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা সর্বহারা জনগণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করছে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি আজ কৃষক আন্দোলনের মূলমন্ত্র; ঐ গুলি কার্যে পরিণত করলে তবে শতাব্দীর অত্যাচারক্লিষ্ট ভারতের অগণিত কৃষককূলের, তথা সমগ্র ভারতের, বর্তমান সামাজিক রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক মরণ-সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব!—কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের গতি লক্ষ্য ক'রে বলা যায়—সে দিন সুদূর নয়!

—সমাপ্ত—